প্রকৃত উন্নতি হইতে দেখা যায়। ভারতীয় আর্য্যগণ ও বর্ত্তমান সমুদয় সভ্যজাতির সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এ কথার সত্যতা অধিকতর স্পষ্টীকৃত হয়। আর্য্যভারতের শাসনকর্ত্তাদিগের যখন লোক শিক্ষা ও জনসাধারণের উন্নতি এক প্রধান কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত ছিল, দেশীয় পুরুষগণ অনেকেই উন্নতচেতা ও সুশিক্ষিত ছিলেন, তখনই ভারতমহিলাদিগের অবস্থা প্রকৃত উন্নত হইয়াছিল। আমরা এখন যেমন বিদেশীয় রমণীগণের উন্নতাবস্থার পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়া থাকি, আর্য্য ভারতের মহিলাকুলের উন্নতির বিষয় আলোচনা করিলেও সেইরূপ চমৎকৃত ও আনন্দিত হইতে পারি। উপযুক্তরূপে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্মার্জ্জন; নারীজীবনের উপযোগী সুশিক্ষা লাভ অর্থাৎ যাহাতে রমণী-হৃদয়ের স্বাভাবিক শক্তি ও ভাব সকল ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়, পবিত্রতা ও কোমলতা পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই সকল সুশিক্ষা লাভ; মাতা পিতার সুকন্যা, ভ্রাতা ভগ্নীর সুভগ্নী, স্বামীর সুভার্য্যা, শ্বশুর কুলের সুবধূ, পুত্র কন্যার সুমাতা, গৃহধর্ম্মে সুগৃহিণী, সমাজের সাধুতা ও মঙ্গলবর্দ্ধিনী, উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষগণের সুদক্ষা সহকারিণী, স্বাধীনচিন্তা ও আত্মসংযমে সক্ষমা—যে সকল বিষয় নারীজাতির পূর্ণোন্নতির পরিচায়ক, তাঁহাদিগের তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। ভারতীয় সুলভা, বিশ্ববারা, ভারতীয় অনসূয়া মৈত্রেয়ী, ভারতীয় গৌতমী গার্গী, ভারতীয় সীতা সাবিত্রী, ভারতীয় শৈব্যা মদালসা, ভারতীয় খনা, লীলাবতী প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কালক্রমে ভারতবর্ষে যখন ধর্ম্মবিপ্লবের সহিত শিক্ষাবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে লাগিল, সমাজের কর্ত্তৃপক্ষ পুরুষগণ ক্রমশঃ অশাসিত-চরিত্র হইতে লাগিলেন, ভারতরমণীগণের অবস্থাও তখন ক্রমশঃ 'হীনতর' হইয়া উঠিল। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান সময়ে, বৌদ্ধধর্ম্মের 'নীরস বৈরাগ্য' ত্যাগ করিয়া ভারতবাসিগণ যখন দলে দলে ভোগবিলাসিতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন,—বলিতে বুক ফাটিয়া যায়—তখন ভারতমহিলাদিগের আধ্যাত্মিক সম্মান গৌরব এতদূর বিনষ্ট হইয়াছিল যে পুরুষদিগের অনেকেই তাঁহাদিগকে খেলানা বা বিলাসের জিনিস মাত্র মনে করিতেন! পরবর্ত্তী সময়ে রাজস্থানের ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভবা রমণীগণ অনেকটা সুশিক্ষা, গৌরব ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারতের অন্যান্য রাজগণ অর্থাৎ নন্দ বংশ, মৌর্য্যবংশ, পালবংশ ও সেন বংশের রাজগণ ভারতরমণীদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য যে বিশেষ কোনও চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং মৌর্য্যবংশীয় রাজত্ব স্থাপয়িতা পণ্ডিতবর চাণক্য, জনসমাজে সাধারণ নারীচরিত্র অতি ঘৃণিত ভাবে চিত্রিত করিয়া তাহাদিগকে অপ-

দম্ভ করিয়া গিয়াছেন; আবার সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তন করায়, বহুবিবাহের বিস্তৃতি হেতু বঙ্গবাসিনীদিগের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে হিন্দুরাজগণের সময়েই ভারতমহিলাগণের অবস্থার অবনতি সাধিত হয়।

ইহার পরে মুসলমানগণের রাজত্ব। মুসলমান রাজগণও পর্য্যায়ক্রমে ভারতের সিংহাসন ভোগ দখল করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে দেশীয় প্রজাগণের স্বশিক্ষা ও রমণীগণের উন্নতির সহায়তা করিতে ইচ্ছুক, এ রকম লোক বড় কেহ ছিলেন না; বরং মুসলমানদিগের শাসন সময়ে ভারতরমণীদিগের 'অবরোধ প্রথা' প্রচলিত হয়। মহম্মদ অবরোধ প্রথার প্রবর্ত্তক। কথিত আছে, তিনি নিজে স্ত্রীদিগের প্রতি সর্ব্বদা সন্দিগ্ধমনা ছিলেন, তাই ভার্য্যাদিগের কাহারও দোষের শাস্তিস্বরূপ 'পর্দ্দা নসীন' করেন। এইজন্য মহম্মদের শিষ্য সেবকদিগের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত হয়। যাঁহারা প্রাচীন পুরাণ ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা জানেন যে আর্য্যভারত হইতে পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত, ভারতমহিলাগণ অন্তঃপুরবাসিনী হইলেও প্রয়োজনানুসারে সভামধ্যবর্ত্তিনী বা রাজপথচারিণীও হইতে পারিতেন। কিন্তু মুসলমানদিগের দৃষ্টান্তে ভারতের অনেক স্থানেই অবরোধ প্রথা বদ্ধমূল হয়; অবরোধ প্রথার প্রবর্ত্তনেই স্ত্রী চরিত্র নিতান্ত 'লঘু' বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস জন্মে এবং স্ত্রী জাতির সুশিক্ষার বিশেষ অন্তরায় হয়।

এতদ্ভিন্ন, মুসলমান রাজত্ব কালে যে সকল ভোগ বিলাসী দুষ্ক্রিয়াসক্ত মুসলমানগণ রাজা বা রাজপুরুষপদ লাভ করিতেন, তাঁহাদিগের অনেকে এরূপ দুর্বৃত্ত নরপিশাচ ছিলেন, যে কোনও রূপ গুণবতী মহিলার বিষয় জানিতে পারিলেই তাঁহাকে, তাঁহারা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেন। এই কারণে ভারত মহিলাগণের অভিভাবকেরা নিজ নিজ পরিবারস্থা রমণীগণকে রূপ গুণের অতীত করিয়া রাখিতে চাহিতেন। ইহাতে ভারতমহিলাদিগের অবস্থা যে কিরূপ অধঃপতিত হইয়াছিল, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহা কতক দূর বুঝিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

"বিগত শতাব্দীতে ভারত মহিলাগণের অবস্থা"র বিষয় আলোচনা করিতে, এতকালের পুরাতন ঘটনার উল্লেখ করিতে হইল, ইহার তাৎপর্য্য এই যে উল্লিখিত ঘটনাবলীই পরবর্ত্তী সময়ে, মহিলাগণের অবস্থা গঠনের মূল। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতমহিলাদিগের সাধারণতঃ যে অবস্থা হইয়াছিল, উল্লিখিত ঘটনা সমূহও তাহার কারণ স্বরূপ।

এতদ্ভিন্ন, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে সমাজে রাজা লোকশিক্ষার সহায়, ও সাধারণ পুরুষগণ সুশিক্ষাপ্রাপ্ত ও উন্নতচেতা, সেই সমাজেই স্ত্রীজাতির প্রকৃত

উন্নতি হইয়া থাকে। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষ ইংরাজরাজের নবাধিকৃত রাজ্য; ভারতের রাজকীয় কার্য্য সকল তখনও সুশৃঙ্খলরূপে চলিতেছিল না; কোনও বন্দোবস্তই এখনকার মত "উপযুক্ত" ছিলনা; তাহার উপরে ঠগী, বর্গী, চোর, ডাকাইত এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদিগের বড়ই উপদ্রব ছিল। এই সকল কারণে বৃটিষরাজ তখন পর্য্যন্ত লোক শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ করিতে পারেন নাই। এদিকে, দেশের পুরুষ জাতির সাধারণতঃ উচ্চতর শিক্ষা ছিল না, কারণ এদেশের অনেক পুরুষ আর্য্য ভাষা সংস্কৃত ছাড়িয়া আরবী ও পারসী শিক্ষা করিতেন, আর্য্যগণের মহতী শিক্ষা গ্রহণ করিতে অনেকেই অশক্ত ছিলেন; আরবী ও পারসী ভাষায় শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতীয় হিন্দু জাতির জীবন গঠিত হইত না। বোধ হয় বলা বাহুল্য যে, যে পাশ্চাত্য শিক্ষা এখনকার দিনে মনুষ্যত্ব লাভের উচ্চতর উপায় বলিয়া পরিগণিত, সে পাশ্চাত্য শিক্ষা তখন এ দেশে প্রচলিত ছিল না। এই সকল কারণে পুরুষেরা স্ত্রীজাতির জাতীয় অবস্থা উন্নত করিবার জন্যও কোনও চেষ্টা করিতেন না। দিনের পরে দিন যাইতেছিল, ভারত রমণী একই অবস্থায় অবস্থিত ছিল; তাহাদের অবস্থার যে কখনও পরিবর্ত্তন হইবে, একথা কেহই জানিত না। তখন পুরুষ জাতির জীবন যেমন সহজ ভাবে গঠিত হইত, তাঁহাদের পালিতা ও রক্ষিতা স্ত্রীজাতির জীবনও তদধিক সহজ ভাবে গঠিত হইত। সাধারণ স্ত্রীজাতির অবস্থা আলোচনা করিলে এ বিষয়ে আমরা অনেক দূর বুঝিতে পারিব, এই জন্য তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত অবস্থা, পারিবারিক অবস্থা, এবং সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই খানে বলা আবশ্যক যে এক শতাব্দীতে চারিযুগ ধরিলে, প্রত্যেক ২৫ বৎসর এক এক যুগ গণনা করিতে হয়। আমরা ১২০১ সাল হইতে ১২২৫ সাল পর্য্যন্ত প্রথম যুগ, ১২২৬ সাল হইতে ১২৫০ সাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যুগ, ১২৫১ সাল হইতে ১২৭৫ সাল পর্য্যন্ত তৃতীয় যুগ, ১২৭৬ সাল হইতে ১৩০০ সাল পর্য্যন্ত চতুর্থ যুগ গণনা করিয়া ভারত মহিলাদিগের অবস্থা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এস্থলে, প্রথম যুগে ভারতমহিলাগণের যে অবস্থা ছিল তাহাই প্রথম আলোচ্য।

(ক্রমশঃ)

বিপদে সম্পদ।

দৈত্যরাজ বলিকে লইয়া বামনদেবের যে লীলাখেলা, পুরাণে বর্ণিত আছে, তাহা বিপদ কি সম্পদ? ঐ ঘটনাকে কেহ বলিরাজার বিপদ, কেহ বা সম্পদ কহিয়া

থাকেন। উভয় পক্ষই সত্যবাদী। কেননা লোকে স্ব স্ব রুচি ও স্বভাব অনুসারেই লৌকিক ঘটনাবলীর বিচার করিয়া থাকেন। যাঁহারা বহির্মুখ, লৌকিক ভোগসুখই যাঁহাদিগের চরম লক্ষ্য, তাঁহারা ঐ ঘটনাকে বলিরাজার বিপদ মনে করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা পরমার্থ-পরায়ণ, অন্তর্মুখ, তাঁহাদিগের চক্ষে ঐ ঘটনা পরম সম্পদ। মহারাজ বলি ও তৎ মহিষী শ্রীমতী বৃন্দা দেবী ঐ ঘটনাকে কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে আমরা তাহা সংকলন করিলাম; বামাবোধিনীর পাঠক ও পাঠিকাগণ স্ব স্ব প্রকৃতি ও বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে উহার তাৎপর্য্য বুঝিবেন।

মহাভক্ত শ্রীমান্ প্রহ্লাদ মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান্ বলি মহারাজ রাজ্যের সুশাসন, সুশৃঙ্খলা, দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি গুণগ্রামে ত্রিলোকবিখ্যাত ও জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় যশস্বী হইয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাতে ঈর্ষ্যাকাতর হইয়া বলির রাজ্যশ্রী কৌশলে হরণ করিবার জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। দেবগণের চিরসহায় ভগবান্, ইন্দ্রের প্রার্থনার বশবর্ত্তী হইয়া এক অপূর্ব্ব ভুবনপাবনী লীলার অবতারণা করিলেন। দেবকার্য্য ছল মাত্র, অমানুষী লীলা বিস্তার দ্বারা জীব চরিতার্থ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। বলি ছলিবার জন্য অলৌকিক ব্রাহ্মণবটুরূপে কশ্যপ গৃহে অবতীর্ণ হইলেন।

এদিকে বলিরাজা মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া ভূরি দান করিতেছেন। বটু ব্রাহ্মণরূপী ভগবান্ বলির যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন। শ্রী অঙ্গের তেজঃপুঞ্জে সূর্য্যালোকও স্তিমিত হইয়া গেল। বলি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চকিত ও চমৎকৃত হইয়া নির্নিমিষলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে বলি প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং গলগ্রীকৃতবাসে বামনদেবকে রত্নময় উচ্চাসনে বসাইলেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে মৃদুমধুরভাবে কহিতে লাগিলেন, "কি অভিলাষে এবং কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশে এ দাসের ভবনে আপনার শুভাগমন হইয়াছে?" বামনদেব কহিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ, কিঞ্চিৎ ভিক্ষালাভের আশায় আসিয়াছি। যদি দানের প্রতিজ্ঞা করেন, তবে যাচ্ঞা করি। নচেৎ বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি?" রাজা কহিলেন, "যে অর্থ চাহিবেন, তাহাই দিব।"

বামনের লোকাতীত সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহাকে লোকাতীত পুরুষ বলিয়া বুঝিতে কাহারই কষ্ট হয় না। গুরু শুক্রাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা পরমযোগী তিনি অনায়াসেই বুঝিলেন যে, বিষ্ণু ছদ্মবেশে আসিয়াছেন। তিনি বলিকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন,—'তুমি আপন দোষে আপনার অনিষ্ট করিলে, এ ত মনুষ্য নহে, তোমার বিপক্ষের পক্ষ হইয়া স্বয়ং ভগবান্ তোমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছেন।'

'রাজা বলে গোঁসাই যে আপনে কহিলে।
ছদ্মরূপে বিষ্ণু আইলা যাচ্ঞার ছলে॥
তবেত ইহার পর ভাগ্য কি আছয়।
যাহা চাহে তাহা দিব সেই ধন্য হয়॥'

রাজা গুরুকে উপরি উক্ত বাক্য কহিয়া পুনরায় বটুকে কহিলেন, "আপনি স্পষ্ট করিয়া বলুন, কি ভিক্ষা চাহেন।" বামনদেব কহিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, এজন্য আমার পাদ পরিমিত 'ত্রিপাদ' ভূমি ভিক্ষা করি।" যজমানের পরম হিতৈষী গুরুপুরোহিত শুক্রাচার্য্য পুনঃ পুনঃ নয়নভঙ্গীদ্বারা রাজাকে প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজা তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। তিনি বামন দেবকে পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র প্রার্থনা পরিহার পূর্ব্বক ধন-রত্ন গ্রাম ঐশ্বর্য্যাদি প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বামন দেবের একই প্রার্থনা। রাজা অগত্যা প্রার্থী ব্রাহ্মণের ইচ্ছানুসারে ত্রিপাদ ভূমি দানে স্বীকৃত হইলেন। রাজার এইরূপ ব্যবহারে শুক্রাচার্য্য অতিশয় কোপান্বিত হইয়া রাজাকে যারপর নাই গালি দিলেন। শুক্রাচার্য্যের গালি ও তিরস্কার শুনিয়া হাসিতে হাসিতে,—

'রাজা কহে বিষ্ণু যদি প্রতিগ্রহ করে।
তাহার অধিক ভাগ্য কি আছে সংসারে?
নতুবা ও যদি হয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ।
প্রতিশ্রুত হয়ে পুনঃ অন্যথা করণ॥
নরকের দ্বার সেই অযশঃ ভুবনে।
জীয়ন্তে মরণ তুল্য ধিক্কার জীবনে॥'

শুক্রাচার্য্য অর্থনীতি-বেত্তৃগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। 'শুক্রনীতি' নামে অর্থশাস্ত্র অদ্যাপি প্রচলিত আছে, বিষয়িগণের তাহা অনেক কাজে লাগে। রাজার ভাব দর্শনে শুক্রাচার্য্য পুনরায় তাঁকে উপদেশ দিলেন যে, অর্থের রক্ষণে মিথ্যা কথা বা অধর্ম্মাচরণে কোন দোষ হয় না, অতএব আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিলে, অচিরে রাজ্যশ্রীভ্রষ্ট হইবে। গুরুর এই কঠোর অভিসম্পাতে রাজা ও রাণী দৃক্পাতও করিলেন না। বিশেষতঃ রাণী বৃন্দাবলী দূর হইতে শুক্রাচার্য্যের ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইলেন। শত শত দাসী-পরিবৃতা থাকিলেও স্বহস্তে জলপাত্র লইয়া যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া সহর্ষ-ক্রোধবচনে কহিলেন,—

'মহারাজ শ্রীচরণ শীঘ্র ধৌত কর।
সাধুর সম্মত নিজ মঙ্গল আচর॥
মুনি ঠাকুরের শাপে যে হয় হউক।
রাজ্য, শ্রী, অর্থ যায়, নরক যাউক॥
প্রতিকূল মুনিবাক্য সব তেয়াগিয়া।
যাহা আছে তাহা দেহ সৌভাগ্য মানিয়া॥
এ হেন ভাগ্যের সীমা সাধুর দুর্লভ।
আজ সে তোমার অগ্রে সংপ্রতি সুলভ॥
অতএব অতি শীঘ্র শ্রীচরণ আগে।
সমর্পণ কর ধন প্রাণ যাহা মাগে॥
এত বলি বৃন্দাবলী জল ঢালে পদে।
মহারাজ বলিরাজ প্রক্ষালে আমোদে॥
দুখানি সুন্দর পদ প্রক্ষালন করি।
হৃদয়ে ধরয়ে পুনঃ চক্ষে বহে বারি॥

শ্রীচরণ ধৌত জল মস্তকে ধরিল।
জনম সফল কৃতকৃতার্থ মানিল॥
যে চরণ রজঃ শিব অদ্যাপি যতনে।
মস্তকে ধারণ করি শিব করি মানে॥
বারি ঝারি কুশ তিন তুলসী লইয়া।
ত্রিপাদ ধরণী দানে উদ্‌যুক্ত হইলা॥"

ব্রাহ্মণকে অঙ্গীকৃত দান করিতে রাজা ও রাণীর এতাদৃশ উদ্যম দেখিয়া শুক্রাচার্য্য পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোবিন্দচরণাসক্ত রাজা ও রাণী কোন রূপেই অভীপ্সিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। তখন শুক্রাচার্য্য উপায়ান্তর না দেখিয়া অণিমা সিদ্ধির প্রভাবে সূক্ষ্মতম মক্ষিকারূপ ধারণ পূর্ব্বক ঝারির নলে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে দানের সংকল্পকালে জল পতিত না হওয়ায় দানের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। বামন দেবের ইঙ্গিত মতে রাজা নলমধ্যে এক কুশা প্রবেশ করাইলেন। তাহাতে শুক্রাচার্য্যের চক্ষু বিদ্ধ হইয়া গেল। তিনি সেই হইতে কাণা। অনন্তর বিধিমতে ত্রিপাদভূমি বামন দেবকে দত্ত হইল। এই ঘটনায় প্রভুর তিনটী কার্য্য সাধিত হইল, দেব কার্য্য-সাধন; বলিকে কৃতার্থকরণ এবং ভুবন-পাবনী লীলা বিস্তার।

ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণ কালে বামন দেব ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক এক পাদে পৃথিবী, এক পাদে স্বর্গাদি ব্যাপিলেন; তৃতীয় পাদের উপযুক্ত স্থান রহিল না। তখন বলিলেন, "বলিরাজ, তুমি প্রতিশ্রুত দানে অসমর্থ হওয়ায় আমার দণ্ডার্হ হইলে।" ভগবানের এই উক্তির পর নাগপাশ বলিকে বন্ধন করিল।

"মহারাজ প্রেমাবেশে আনন্দিত হৈলা॥
প্রভুর যে গূঢ়াশয় কে বুঝিতে পারে।
কোন্ ছলে অনুগ্রহ নিগ্রহ বা কারে॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দেব গণ।
নারদ প্রহ্লাদ আদি করয়ে স্তবন॥
বলিরাজ কহে কিছু অপূর্ব্ব কথন।
তাহা কিছু কহি শুন কর্ণের শোধন॥
বলিরাজ কহে প্রভু দয়ার সাগর।
তুমি সে শরণ্য প্রভু জগৎ ভিতর॥
মুই হেন মূঢ় পাপী অধম অগ্রাহ্য।
পর-দ্রোহকারী নীচ সতের অভুজ্য॥
এ হেন পামর জনে এত কৃপা কৈলা।
ভজন সাধন কিছু হেতু না গণিলা॥
তোমার কৃপায় কোনরূপে নহি পাত্র।
প্রহ্লাদের পৌত্র এক হেতু দেখি মাত্র॥
তোমার আশয় প্রভু অতি সে গভীর।
বুঝিতে আছয়ে কোন্ জন হেন ধীর॥
পুরন্দর পক্ষ হয়ে ছলিতে আমারে।
তাহারে অনর্থ দিয়া অর্থ দিলা মোরে॥
দেবরাজ মূর্খ ইহা বুঝিতে নারিলা।
ক্ষুদ্র অর্থ সাধনে তোমারে পাঠাইলা॥
তোমা হেন ধন নাহি চিনিল বর্ব্বর।
কাঞ্চন বেচিয়া নিল সুতুচ্ছ কঙ্কর॥
সাধুর অগ্রাহ্য রাজ্য অনিত্য অসার।
সেই তুচ্ছ ধন হেতু হারাইল সার॥
তুমিত দুর্লভ ধন সারাৎসার বস্তু।
না চিনিল মূঢ় মন্দমতি বস্তু তস্তু॥

বড় কৃপা কৈলে মোরে মায়া ফাঁদ হতে।
মুক্ত করি দিলে নিজ চরণ অমৃতে॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ বলির বচন।
শুনিয়া প্রশংসা করে আনন্দিত মন॥
ইন্দ্র দেব বাক্য শুনি সলজ্জ হইলা।
বলিরাজে ধন্য মানি আপনে নিন্দিলা॥"

প্রভু যদিও বলির চরিত্র দর্শনে অন্তরে পরিতুষ্ট হইলেন, কিন্তু বাহ্যে নিষ্ঠুরের ন্যায় বাক্য কহিলেন। সেই নিষ্ঠুর বাক্য দ্বারা বলিরাজার ভগবদ্‌ভক্তি অগ্নি পরিশুদ্ধ কলধৌতবৎ শত গুণ উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইল। প্রভু কহিলেন,—

"হারে রে দুর্ম্মতি মোর তৃতীয় চরণ।
কোথায় রাখিব কহ শীঘ্র দেহ স্থান॥
বলি বলে শ্রীচরণ রাখিবার যোগ্য।
আমার মস্তক এই স্থান হয় দীর্ঘ॥
ইহাতে রাখহ পদ-কমল সুন্দর।
বাক্যদণ্ড হইতে মুই হইনু অবসর॥
তোমার জগৎ এই শরীর তোমার।
তোমার চরণে সঁপিলাম সে নির্দ্ধার॥
তুমি প্রভু তুমি বিভু তুমি জগন্নাথ।
বিশেষতঃ হও তুমি অনাথের নাথ॥
যেই ইচ্ছা কর তুমি শরণ লইনু।
আত্মনিবেদন এবে চরণে করিনু॥
বলির সৌভাগ্য কিবা কহনে না যায়।
জগন্মঙ্গল পদ ধরিলা মাথায়॥"

বলিরাজের এই অপার সৌভাগ্য দর্শনে "জয় জয়, ধন্য ধন্য, নমোনমঃ" শব্দে ত্রিভুবন মুখরিত হইল। প্রভু বলিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং গদ গদ মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন,—

"তুমি মোর প্রিয় আমি তোমার বিক্রীত।
হইলাম নিত্যবদ্ধ পরাণ সহিত॥"

এই বলিয়া পাতালপুরে মণিমন্দিরে বলিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনি চিরকালের জন্য বলির স্বামী হইয়া রহিলেন। এই "বলিভূমি" কাহার কাহার মতে দক্ষিণ আমেরিকার "বলিভিয়া।" যাহাহউক যেখানে অহৈতুকী ভক্তি, সেই খানেই ভগবানের এইরূপ লীলা। ঐরূপ ভক্তিব্যতিরেকে তৎপ্রাপ্তির অন্য উপায় নাই। গীতাতে স্পষ্টাক্ষরেই উক্ত হইয়াছে,—

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন নচেজ্যয়া।
শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥"

বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান যজ্ঞ ইত্যাদি কিছুই ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু নহে; কেবল অব্যভিচারী, অনন্যা বা অহৈতুকীভক্তি দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

কুমারী ওয়েষ্টন্।

কুমারী আগ্নিস্ ওয়েষ্টন্ নাবিকদিগের পরম বন্ধু। পোর্ট্‌সমাউথ্, ডিভনপোর্ট প্রভৃতি বন্দরে ইঁহার নাম প্রত্যেক লোকের নিকট পরিচিত; ইনি ধর্ম্ম-প্রচার ও মাদক সেবন নিবারণ ব্রতে প্রায় ২৭ বৎসর কাল ব্রতী আছেন। ইঁহারই যত্নে একজন সামান্য নৌ-সৈনিক নিউইয়র্কের মেডিকেল মিসনের অধ্যক্ষ হইয়াছেন, তাঁহার নাম জর্জ্জ ডোকন্ট। ইহার পর এই গুণবতী রমণীর সাহায্যে আরো অনেক হতভাগ্য সৈনিক সুখসৌভাগ্য ও উন্নতজীবনের অধিকারী হইয়াছে। ইনি "Royal Naval Temperance Society." রাজকীয় নাবিক মাদক নিবারণী সভার সৃষ্টিকর্ত্রী। এই সভার শাখা ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীনস্থ প্রত্যেক অর্ণবপোতে প্রতিষ্ঠিত আছে; "Ashore and Afloat" স্থলে ও জলে নামক মাসিক পত্রিকা এই সভার মুখপাত্র। কুমারী ওয়েষ্টনের এক জীবনসহচরী এই পত্রিকার সম্পাদিকা। গতবর্ষে ইহার চারি লক্ষাধিক খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন কুমারী ওয়েষ্টন পুরুষদিগের জন্য এবং বালকদিগের জন্য এক একখানি স্বতন্ত্র মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়া থাকেন। কুমারী যে সকল নাবিককে মদ ছাড়াইয়াছেন, তাহারা মিতাচারিতার আশ্চর্য্য ফল জীবনে প্রদর্শন করিতেছে। ইহারা এক এক জন যে কার্য্য করিতে পারে, দুইজন মাতাল নাবিক তাহা পারে না।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনায় সন্তানের মুক্তি।

(৩৫৮ সংখ্যা ২০৫ পৃষ্ঠার পর)

মানব হৃদয়ে সৎ ও অসৎ, এই দুই প্রকার বৃত্তি আছে। সৎবৃত্তির কার্য্য পুণ্য, অসৎ বৃত্তির কার্য্য পাপ। যিনি অসৎবৃত্তিদিগকে সংযত করিয়া সৎবৃত্তি-দিগকে পরিচালনা করেন, তাঁহাকে আমরা সাধু বা সাধ্বী বলিয়া থাকি, আর যিনি সৎবৃত্তিদিগকে সংযত করিয়া অসৎ-বৃত্তিদিগকে পরিচালনা করেন, তাঁহাকে আমরা পাপাত্মা বা পাপীয়সী বলি। সৎবৃত্তির অনুশীলনেই মানব সৎকার্য্য করেন, আর অসৎবৃত্তির অনুশীলনেই মানব অসৎ কার্য্য করেন। সাধুতা লাভ করা মনুষ্যজীবনের যে সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য, একথা কে না জানেন? এই সাধুতা লাভ করিতে হইলে অসৎবৃত্তিদিগকে সংযত রাখা এবং সৎবৃত্তি বা দেব-বৃত্তিদিগকে সম্প্রসারিত করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎবৃত্তির সম্প্রসারণেই মানবের মুক্তি লাভ হয়।

ভক্তি-বৃত্তি মানবের সর্ব্বপ্রধানা দেব-

বৃত্তি। এই বৃত্তির উদয়ে মানবের পশুত্ব দূর হয়, এই বৃত্তির বর্দ্ধনে মানবের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, এই বৃত্তির পূর্ণ বিকাশে মানবের দেবত্ব লাভ হয়। উৎপত্তি, বর্দ্ধন ও পূর্ণ বিকাশ, ভক্তির এই তিন অবস্থা। ইহাকে আমরা প্রথমাবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা ও তৃতীয় অবস্থা বলিতেছি এবং হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভক্তি হইতে এই সকল অবস্থার লক্ষণ সংগ্রহ করিতেছি, ভরসা করি পাঠক পাঠিকাগণ ইহাতে বিষয়টী সহজে বুঝিতে পারিবেন।

হিন্দু শাস্ত্রে বলে।—

"পূজ্যেষ্বনুরাগো ভক্তিঃ।" (অমরসিংহ)

পূজনীয়ের প্রতি যে অনুরাগ, তাহাই ভক্তি। আমরা ইহাকে ভক্তির প্রথম অবস্থা বলিতেছি। পূজনীয় ব্যক্তির উপরে অনুরাগই এই অবস্থার লক্ষণ। অন্যত্র "অত্যন্তানুরক্তিরীশ্বরে ভক্তিঃ।"

(শাণ্ডিল্য সূত্র।)

ঈশ্বরে অতিশয় অনুরাগই ভক্তি। শ্লোকটী ঈশ্বরভক্তি বিষয়ক হইলেও ভক্তিমাত্রেরই লক্ষণপ্রকাশক। সকল প্রকার ভক্তিরই দ্বিতীয় অবস্থা এই রকম অর্থাৎ ভক্তিভাজনের প্রতি অতিশয় অনুরাগ হইয়া থাকে। অন্যত্র

"যতোশ্চিত্তাত্মনোরৈক্যং ভক্তিযোগ
উদাহৃতঃ।"

পরমাত্মার সহিত যদ্দ্বারা মনের একতা সাধিত হয়, তাহাই ভক্তি যোগ। ইহাই ভক্তির তৃতীয় অবস্থা। ভক্তিভাজনের সহিত মনের একতা সাধনই এ ভক্তির লক্ষণ। ভক্তিভাজন স্বয়ং জগদীশ্বর হউন বা অন্য কেহ হউন, তাহাতে ভক্তির কোনও ব্যত্যয় হয় না। ভক্তিই বরং ভক্তিভাজন মানবকে দেবতা স্থানীয় করিয়া থাকে।

ভক্তি-বৃত্তির ক্রিয়াকে উপাসনা কহে। ভক্তিভাব মনে, উপাসনা কার্য্যে। উপাসনা কর্ম্ম-স্থানীয়, ভক্তি জ্ঞানস্থানীয়। উপাসনা যোগে ভক্তিবৃত্তি সম্পূর্ণতা লাভ করে। ভক্তিবৃত্তির ক্রম বিকাশের সহিত উপাসনাও ক্রমবিকাশ লাভ করে। তাহা ক্রমে বলিতেছি।

ভক্তিবৃত্তি মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি। ইহার মধ্যে পার্থিব ভক্তি বিষয়ে মাতৃ-ভক্তিই শ্রেষ্ঠতম। ভক্তির প্রথম অবস্থা পূজনীয়ের প্রতি অনুরাগ —এই অনুরাগের কারণ পূজনীয়ের শ্রেষ্ঠতা। অতএব বয়সের শ্রেষ্ঠতা, সম্পর্কের শ্রেষ্ঠতা, গুণের শ্রেষ্ঠতা ইত্যাদি শ্রেষ্ঠতাই ভক্তির অবলম্বনীয়। পরকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস হইলে ভক্তির উদয় হয়। ইহাই ভক্তির প্রথম অবস্থা। ভক্তির প্রথম অবস্থাতেই মানবের আত্মাভিমান খর্ব্ব ও গুণানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সন্তানের পক্ষে মাতাই সংসারের শ্রেষ্ঠতমা, তাই মাতার মাতৃত্ব বুঝিতে পারিলে তাঁহার প্রতি ভক্তি হওয়া সন্তানের স্বাভাবিক। এই মাতৃ-ভক্তির উচ্ছ্বাসে সন্তানের কেবল আত্মাভিমান খর্ব্বও গুণানুরাগ বর্দ্ধিত হয় না ; সন্তানের সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার চূর্ণ হয় ও আত্মার সদ্গুণ সমূহ

পরিবর্দ্ধিত হয়। এ জগতে মাতা সন্তানের দেবতা ; সন্তান মাতার তুলনায় জীবাণু মাত্র ; সন্তানের আবার আত্মশ্লাঘার কি আছে ? সন্তান জানেন তিনি মাতৃ-শোণিতে গঠিত, মাতৃহস্তে পালিত, এবং মাতৃ-স্নেহে জীবিত। প্রাপ্তবয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য, রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুখ, সম্পত্তি, খ্যাতি, কীর্ত্তি, আত্মীয়, বন্ধু, সবই মিলিতে পারে, কিন্তু এ সৌভাগ্যের আধার যে দেহ ও জীবন, তাহা তো মাতৃ-করুণায় সঞ্জীবিত রহিয়াছে! নিরাশ্রয় শৈশবে যদি মাতৃ-স্নেহের এক বিন্দু অভাব হইত, মাতার প্রাণপণ যত্নের একবিন্দু ত্রুটি হইত, তবে সন্তান কেমনে রক্ষা পাইত ? তাই বলিতেছি যে মা'কে মনে করিলেই লোকে আপনার ওজন বুঝিতে পারে—আপনার ক্ষুদ্রত্ব জানিতে পারে। আপনার ক্ষুদ্রত্ব জানিতে পারা মানবের এক মহা সৌভাগ্য। কারণ সসীম মানব অসীম সুখ-প্রার্থী হইলেই তাহার হৃদয়ে অহঙ্কার প্রবেশ করিতে পারে। অহঙ্কার অর্থে কেবল বড়াই নহে, অহঙ্কারের প্রকৃত অর্থ আপনাকে বিশ্বজগতের কেন্দ্র করিয়া "আমি আমি" করিয়া বেড়া'ন। এই রকম অহঙ্কারই মানবের কুবৃত্তির মূল ও কুবৃত্তিই পাপের মূল। লোভ, ক্রোধ হিংসা, পক্ষপাতিতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, স্বার্থ পরতা প্রভৃতি কুবৃত্তি হইতে চৌর্য্য, বিবাদ, অসত্য, ব্যভিচার, হত্যা প্রভৃতি মহাপাতক ঘটনা হইয়া থাকে। এই সকল কুবৃত্তির মূলানুসন্ধান করিলে জানা যায় যে এক মাত্র অহঙ্কারই ইহাদিগের উৎপত্তি স্থান। এইজন্য শাস্ত্রে লিখিত আছে "নাহঙ্কারাৎ পরো-রিপুঃ" অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে প্রবল শত্রু আর নাই! এই দুর্দ্দান্ত শত্রুকে যিনি পরাস্ত করিতে চাহেন; তিনি অপরাজিতা অভয়া মাতৃদেবীর শরণাপন্ন হইবেন!—যে মায়ের নিকটে সন্তানকে যমেও ছুঁইতে পারে না, সেই মায়ের কাছে সন্তানকে অহঙ্কার রাক্ষস গিলিবে কি করিয়া ? তাই মায়ের কাছে দাঁড়াইলে সন্তানের সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়, হৃদয় প্রকৃত বিনীত হয়। মানব যতই ক্ষমতাপন্ন হউন না কেন, বিশ্বস্রষ্টার চক্ষে তিনি সৃষ্ট পদার্থ ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন ; আর সন্তান যতই গৌরবান্বিত হউন না কেন, তাঁহার মায়ের কাছে তিনি সেই "কোলের ছেলে" সেই আদরের "যাদুমণি" ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন! মহাত্মা জর্জ্জ ওয়াসিংটন যখন আমেরিকার স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিলেন, যখন তাঁহার মহতী কীর্ত্তি গগন প্রতিধ্বনিত করিতেছিল, যখন স্বদেশীয়গণ কৃতজ্ঞচিত্তে প্রাণের প্রাণে সেই কীর্ত্তিমানের পূজা করিতেছিল, তখন সকলে বিস্মিত হইলেও এক জনের প্রাণে ওয়াসিংটনের "শৈশব" জাগিতেছিল, একজন—তিনি ওয়াসিংটনকে হাতে গড়িয়া "মানুষ" করিয়াছিলেন, আপনার রক্তে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাই এখনও তিনি, ওয়া

সিংটনের মা, মেরী ওয়াসিংটন, গৌরবান্বিত পুত্রকে শিশুর মত দেখিতেছিলেন!—পুত্রের অমানুষিক কীর্ত্তি শুনিয়া সংবাদদাতা মহাত্মা মার্কুইস্ ডি লেফেট্‌কে তিনিই বলিয়াছিলেন, "আমার জর্জ্জি খুব ভাল ছেলে, সে এ রকম কাজ করিবে তার আর আশ্চর্য্য কি?" এরকম কথা সহানুভূতির অল্পতা বা সন্তানের মহত্ত্ব অবোধ্য বলিয়া নহে—ইহা মাতৃভাবের সহজোক্তি। মা' সন্তানকে যে দিন প্রথম পাইয়াছিলেন, সে দিন সন্তান নিরাশ্রয়, অসহায়। মা'র প্রাণে সে দিন চিরদিনই জাগরুক থাকে। তাই জগতের কাছে তাহার কৃতিত্ব অলৌকিক হইলেও মায়ের প্রাণে কেবল সন্তানত্বই বিদ্যমান! তাই মাতৃভক্ত সন্তানের প্রকৃতি অহঙ্কারশূন্য ও বিনীত হয়। মাতৃভক্ত সন্তান কোনও অবস্থাতেই নিজের সন্তানত্ব ভুলিতে পারেন না, তাই "আমার জন্য জগৎ" মনে না করিয়া "জগতের জন্য আমি" মনে করেন। ইহাই নিরহঙ্কার ও বিনয়ের প্রকৃত লক্ষণ।

মাতৃ-ভক্তির প্রথম অবস্থায় অথবা মাতৃ-ভক্তির উদ্রেক মাত্রে মানবের কৃতজ্ঞতা-বৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। কৃতজ্ঞতা যে মহত্ত্বের পরিচায়ক একথা বলা বাহুল্য; কৃতজ্ঞতার জন্য উপকৃত উপকারীকে দেবভাবে দেখে; কৃতজ্ঞতার জন্যই মানবের জাতীয় ভালবাসা রক্ষা হয়, কৃতজ্ঞতার জন্যই মানব ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও ভগবানকে ভালবাসিতে পারে। এসংসারে সন্তান মাতার নিকটেই সর্ব্বাপেক্ষা ঋণী, তাই মা'কে মনে করিলেই সন্তানের কৃতজ্ঞতা উছলিত হইতে থাকে।—যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ, সে মানব কুলের কলঙ্ক। গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যেও অনেক সময়ে, কৃতজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। অকৃতজ্ঞ যে, সে পশুরও অধম। কিন্তু কৃতজ্ঞতা পরীক্ষার সর্ব্বোচ্চ স্থান মাতা। যিনি মাতৃ-ভক্তি করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা বৃত্তি অবশ্য পরিস্ফুট হইয়াছে। মাতা যে সন্তানের কি পরমদেবতা তাহা কৃতজ্ঞ সন্তান ব্যতীত অপরে বুঝিতে পারে না এবং কৃতজ্ঞ সন্তান ব্যতীত কেহ মাতাকে ভক্তি করিতেও পারে না। তাই বলিতেছি মাতৃভক্তির প্রথম অবস্থাতেই সন্তানের কৃতজ্ঞতা-বৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং কৃতজ্ঞতার পরিবর্দ্ধনে মানব-হৃদয়ের মহত্ত্ব সাধিত হয়।

মাতৃ-ভক্তির প্রথম অবস্থায়, সন্তানের হৃদয় যখন অহঙ্কারের অতীত, বিনীত ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হয়, তখন সন্তান মাতাকে সম্মাননা, মাতৃ-চরণ-বন্দনা, মাতার পদধূলি গ্রহণ, মাতার আশীর্ব্বাদেই উন্নতি-আশা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। এই কার্য্য গুলিই প্রথম মাতৃ-উপাসনা। এইরূপ মাতৃ-উপাসনাতে সন্তানের সন্তানত্ব পরিস্ফুট হয়, পশুবৃত্তি সকল সংযত হয়। মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনার প্রথম অবস্থায় সন্তান এইরূপ উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

ইহার পরে ভক্তির দ্বিতীয় অবস্থা। ভক্তির এ অবস্থায় লক্ষণ ভক্তিভাজনের প্রতি অতিশয় অনুরাগ। মাতৃ-ভক্তির এই অবস্থায় সন্তানের হৃদয় মাতাতে অধিকতর অনুরক্ত হয়। সন্তান যতই মাতার মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন, ততই মাতার উপরে তাঁহার অনুরাগ বৰ্দ্ধিত হয়। এই মাতৃভক্তির প্রবলতায় সন্তানের সহৃদয়তা লাভ হইয়া থাকে। সহৃদয়তার অর্থ হৃদয়ের বিস্তৃতি ও কোমলতা। ইহা মাতৃভক্ত সন্তানগণ সকলেই পাইয়া থাকেন। মাতৃভক্ত সন্তান, খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর মহাশয় হউন আর নগণ্য পেঁচো চাঁড়ালই হউন, সহৃদয়তা তাঁহাতে আছেই। সহৃদয়তা মাতৃ-ভক্তির স্বাভাবিক নিয়ম। এই সহৃদয়তা লাভ মানব-জীবনে বড় লাভ। সহৃদয়তা হইতেই লোকে মহত্ত্বের গৌরব বুঝিতে পারে, পর-হৃদয়ের তত্ত্ব বুঝিতে পারে; সহৃদয়তা হইতেই লোকে ভালবাসা, দয়া, সহানুভূতি, ক্ষমা, গুণানুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণে অভ্যস্ত হইতে পারে। সহৃদয়তা উর্ব্বর ক্ষেত্র, এখানে মনুষ্যত্বের বীজ বপন করিতে পারিলে তাহা নিষ্ফল হয় না। সহৃদয় ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তিদিগের পরিচালনায় যদি মহাপাপী হইয়াও থাকে, তথাপি সুশিক্ষা ও সাধু দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাকে সৎপথে আনা যায়। জগাই মাধাই মহাপাতকী হইলেও নিত্যানন্দ প্রভু তাহাদিগকে নবজীবন দিয়াছিলেন কি করিয়া? চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়—নিত্যানন্দ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাদৃশ মহাপাপীদিগেরও হৃদয় ছিল বলিয়া। যদি নিত্যানন্দের মহত্ত্ব তাহারা না বুঝিত, যদি সাধুতা তাহাদের ধারণা না হইত, তবে নিত্যানন্দের সাধ্য কি যে তাহাদিগকে হরিভক্ত করেন! তাই বলিতেছি, মানবের সহৃদয়তাই সকল মহত্ত্বের মূল। মাতৃভক্তি অনুশীলনে সন্তানের এই সহৃদয়তা লাভ হয়। সন্তান মাতাকে যতই ভক্তি করিতে থাকেন, ভক্তি বৃত্তির সম্প্রসারণে ততই হৃদয় বিস্তৃত হইতে থাকে, মাতৃভক্তির মধুরতা যতই আস্বাদন করিতে থাকেন, এই সহৃদয়তার জন্য মাতৃভক্ত সন্তানের মনে মাতৃসুখ কামনা প্রবল হয়—মাতাকে সুখী করিতে পারিলেই সন্তান কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এইজন্য মাতৃসেবা, মাতৃ-আজ্ঞা পালন ও মাতার প্রিয় কার্য্য করা সন্তানের জীবনব্রত হইয়া থাকে। ভক্তির এই কার্য্যগুলি মাতৃভক্তির দ্বিতীয় অবস্থার অন্তর্গত উপাসনা বলা যায়। এই মাতৃউপাসনায় অর্থাৎ মাতৃসেবা, মাতৃ আজ্ঞা পালনাদি হইতে সন্তানের কর্ত্তব্য পালন, সেবাপরায়ণতা ও আত্মত্যাগ অভ্যাস হয়। মাতৃউপাসনায় সন্তান মুক্তি পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

(ক্রমশঃ)

বারমেসে।

পৌষ।

এই মাসের প্রথমে আলু প্রথম ভাঙ্গিতে হয়; অর্থাৎ খাইবার জন্য গোলআলু পৌষ মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হয়। প্রথম আলু তোলার পরই গাছগুলিকে ঈষৎ হেলাইয়া গোড়ায় মাটী ধরাইয়া দিতে হয়। ইহাতে গাছের বহির্ভাগের কিয়দংশ মাটী চাপা পড়ে। এই অবস্থায় ৩।৪ দিন থাকিলে আলুর ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিতে হয়। ঐ সিঞ্চনের পর গাছের অপেক্ষাকৃত তেজো-বৃদ্ধি হয়। তখন আলু গাছের মূলে এবং মৃত্তিকাবৃত অংশের প্রত্যেক পত্রকক্ষে আলু জন্মিতে থাকে। যে সকল আলু পত্রকক্ষে জন্মে, তাহা ক্ষুদ্র হয় বটে; কিন্তু ঐ আলু হইতে উৎকৃষ্ট বীজ প্রস্তুত হয় তাহাকে দোভাঙ্গা বীজ কহে। ইহার মূল্যও অনেক অধিক। প্রতিমণ ১০৲ ১৫৲ টাকা হইতে কখন কখন ২০।২৫ টাকা মূল্যেও বিক্রীত হয়। যে বার বিশেষ পোকা ধরিয়া আলুর বীজ নষ্ট হইয়া যায়, সে বার ৪০৲ টাকা মূল্যেও বীজের মণ বিক্রয় হইয়া থাকে। তাহা যেরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা পরে বলিতেছি।

আমাদের দেশে ফসলের বীজ উৎপাদন, বীজরক্ষা ও বীজ বিক্রয় স্বতন্ত্র ব্যবসায় নহে; কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় উহা একটী স্বতন্ত্র ও প্রধান ব্যবসায়। তত্তদ্দেশের কৃষিশাস্ত্রবিৎ কৃষকেরা বিশেষ যত্নসহকারে বীজের উৎপাদন ও রক্ষা করিয়া থাকেন। বীজের উৎকর্ষ সম্পাদন বিষয়ে তাঁহারা কিরূপ যত্ন ও অধ্যবসায় প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিলে আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হয়। বিলাতে 'চিভেলিয়ান' নামে বিখ্যাত এক প্রকার গম আছে, তাহার তুল্য উৎকৃষ্ট গম বিলাতে আর নাই। ডাক্তার চিভেলিয়ার ঐ গম বীজের সৃষ্টি করেন। তিনি কোন গমের ক্ষেত্রে একটী মাত্র উৎকৃষ্ট শীষ্ পাইয়াছিলেন। ঐ শীষের গমগুলি, ক্ষেত্রস্থ অন্য শীষের গম অপেক্ষা বৃহৎ ও পুষ্ট ছিল। ডাক্তার সাহেব ঐ শীষটীকে আনিয়া উহার গমগুলিকে আপন উদ্যানে বপন করেন। তাহা হইতে প্রথম বর্ষে ঐরূপ উৎকৃষ্ট গম শীষের পরিমাণের শতগুণ অধিক জন্মিল। পর বৎসর ঐ বীজে তাহার শতগুণ জন্মিল। এইরূপে কয়েক বর্ষব্যাপি যত্ন ও অধ্যবসায়ে গমের একটী উৎকৃষ্ট জাতি সৃষ্ট হইয়া ডাক্তার সাহেবের নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ব্যান্হাম নামক একজন বিলাতীয় কৃষক আপনার আবাদে গম কাটা দেখিতেছিলেন। গম-

ক্ষেত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ একটী শীষ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি সেই শীষ্টী তৎক্ষণাৎ সংগ্রহ পূর্ব্বক গৃহে লইয়া গেলেন। সেই বড় বড় ও পরিপুষ্ট গমগুলি একটী ক্ষুদ্র স্থানে বপন করিলেন। তাহাহইতে যে গম জন্মিল, তিনি তাহা বাছাই করিয়া পুনরায় বপন করিলেন। এইরূপে ৩।৪ বৎসরের মধ্যে একখানি ক্ষেত্রের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট গম বীজ প্রস্তুত হইল। ঐ গম অন্যান্য গম অপেক্ষা বড় ও ধারাল শুঁয়া বিশিষ্ট। ঐ শুঁয়া এরূপ ধারাল যে, তাহাতে পাখী বসিতে পারে না। এইরূপে গমের যে জাতি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট গম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং তাহাতে পক্ষীর উপদ্রব এককালে কমিয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশে বীজের বাছুনি ও তাহার রক্ষা বিষয়ে এককালে যত্ন নাই, এরূপ নহে; তবে তদ্বিষয়ে যেরূপ যত্ন ও উদ্যোগ করা আবশ্যক, তাহা হয় না। অথচ কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে ঐ ব্যাপার একটী প্রধান ঘটনা।

পৌষ মাসে আলুগাছের পত্রকক্ষে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলু জন্মে, তাহা যত্নপূর্ব্বক রাখা হয়। ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে ঐ সকল আলু এবং মূলদেশে যে সকল আলু জন্মে, তাহার শেষ ভাঙ্গার কালে অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে বা মাঘ মাসের প্রথমে যখন সমস্ত আলু নিঃশেষ করিয়া তোলা হয়, তখন সেই আলুর মধ্যে যে গুলি ছোট ছোট, সে গুলিকেও বীজের মধ্যে রাখা হয়। যে আলুগুলি মাটীর বাহিরে পত্র কক্ষে জন্মে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজ। তাহাকে অনেক চক্ষু থাকে। তাহার রং প্রায় পত্রের ন্যায় হরিৎবর্ণ হয়। যে বীজের চক্ষু যত অধিক, তাহা হইতে তত বেশী অঙ্কুর নির্গত হয়। ঐ উভয় বিধ বীজ আলু কৃষকেরা বেত বা বাঁশের ঝুড়ী পূর্ণ করিয়া যে ঘরে রন্ধন ও অনাচার হয় না, সে ঘরের আড়ায় শিকা করিয়া ঝুলাইয়া কিম্বা বাঁশের মাচায় রাখে। এত যত্নে রাখিলেও উহার কতক অংশ শুকাইয়া বা পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা আহারার্থ এককালে কিছু অধিক আলু সংগ্রহ করিয়া রাখেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, বর্ষার শেষ ভাগে সেই আলুর অধিকাংশ হইতে ফল বা অঙ্কুর নির্গত হয়। ঐ বীজ আলুরও ঐরূপ ফল বাহির হয়। তাহাতে বীজত্বের কোন হানি হয় না। কৃষকেরা যথা সময়ে ঐ বীজ ভূমিতে রোপণ করে। রোপণকালে অনেক বীজ আলুর ঐ অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া যায়। মাটীতে রোপণের পর পুনরায় সেই সঙ্গে চক্ষু হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। এই সকল বীজকে কৃষকেরা ঝাড়াবীজ কহে।

আলুর বীজ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়াই আলুর বীজের উপসংহার করা হইবে। এদেশের কৃষকেরা যে প্রণালীতে

আলুর বীজ প্রস্তুত ও রক্ষা করিয়া থাকেন, আমরা উপরে তাহাই বিবৃত করিলাম। কিন্তু আলুর বীজ প্রস্তুত করিবার জন্য দেশের কৃষকগণ যে পরিমাণে যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে অথবা ঐ বীজ ক্রয় করিবার জন্য যত অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হয়, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমবিজৃম্ভিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ খাইবার জন্য যে বড় বড় ও পরিপুষ্ট আলু বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া ও তাহাকে ৩।৪ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া যথাকালে ক্ষেত্রে রোপণ করিলেই উৎকৃষ্ট বীজের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। বিহার, আসাম, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানের কৃষকগণ ঐরূপে আলুর আবাদ করিয়া বিশিষ্টরূপে লাভবান্ হইতেছে। আলু একটা আস্ত রোপণ করা অপেক্ষা কাটিয়া রোপণ করায় উভয়তঃ লাভ আছে। প্রথমতঃ একটা আলুতে অনেক চক্ষু থাকাতে এককালে অনেক কল বাহির হয়। ঐ সকল কলের ২।৪ টাকে বিশিষ্টরূপে বলবান্ করিবার জন্য বাকী সমস্ত কলগুলি নষ্ট করিতে হয়। ইহাতে বীজাংশে যেমন ক্ষতি, আবাদাংশেও তেমনি ক্ষতি হইয়া থাকে; কারণ যে সকল কল নষ্ট করিতে হয়, তদ্দ্বারা বীজের অনেক শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, বীজ আলু কাটিয়া রোপণ করিলে, এক এক খণ্ডে অল্পসংখ্য চক্ষু থাকায়, অঙ্কুর বা কলও অল্পসংখ্য নির্গত হয় এবং তাহা নৈসর্গিক নিয়মে বিশেষ বলবান্ হইয়া থাকে। অল্পমূল্যে খাইবার আলু ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা যে, বীজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার কথা লিখিত হইল, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধলেখক প্রধান সাক্ষী। তিনি তাঁহার নিজের কৃষিক্ষেত্রে ঐরূপে আলু ও তাহার খণ্ড সকল বীজরূপে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। অতএব এ দেশে যাঁহারা আলুর চাস আবাদ করিয়া থাকেন, আমরা ভরসা করি, তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে ঐরূপ বীজ ব্যবহার করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের কোনও ক্ষতি হইবে না। অধিকন্তু, আলুর বীজ তৈয়ারি অথবা তাহা ক্রয় করার ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।

কার্ত্তিক মাসের বামাবোধিনীতে পৌষমাসের কৃষি বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে তামাকের পাইট্ করিবার উপদেশ আছে। ঐ পাইট্ কিরূপ, এস্থলে তাহা বিবৃত করা যাইবে।

দোআঁশ মাটীর সমতল ক্ষেত্রে তামাকের চাস হইয়া থাকে। মাঘ মাস হইতে ভাদ্র আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রায় ৮।৯ মাস কাল ভূমিতে পলি কিম্বা বোদ মাটী, অথবা গোবর, সোরা, লবণ, তৃণপত্রজাত সার, কিম্বা নীলের শিটি ইহার যে কোন ২।১টী সার দিয়া অনবরত চাস দ্বারা মাটিকে ধুলিবৎ চূর্ণ করিয়া রাখে। তাহার পর আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে তামাকের চারা ভূমিতে রোপণ করে।

তামাকের চারা ভূমিতে এরূপ ভাবে রোপিত হইয়া থাকে যে, তাহাতে আবশ্যকমত লাঙ্গল চলিতে পারে। পৌষমাসে তামাকের ক্ষেত্রে সোজা সুজি, কোণা কোণি, ও আড়ভাবে নানা প্রকার লাঙ্গল দিতে হয় এবং অতি সাবধানে বারম্বার এরূপে ক্ষেত্র নিড়াইয়া দিতে হয় যেন তাহাতে একটীও তৃণ জন্মিতে না পারে। তামাকের ক্ষেত্রে যত দিন রস থাকে, ততদিন পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দিতে হয়। তামাকের গাছে ১০।১২টী পত্র হইলেই তাহার অগ্রভাগ এবং নিম্ন দেশস্থ ৩।৪টী পাতা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। পত্রকক্ষে যে সকল পত্রমুকুল, বা কুসুম-মুকুল নির্গত হয়, তাহা প্রতি সপ্তাহে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। যখন তামাকের পত্র ও মুকুল ভাঙ্গার কার্য্য চলিতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত লাঙ্গলের সীতা অর্থাৎ দাগ গুলি বুজাইয়া সমস্ত ভূমি সমান করিয়া দিতে হয়। তামাক পত্রের বৃদ্ধি-সম্ভাবনা থাকিতে থাকিতে যদি ভূমির মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া যায় এবং বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে ক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া ২।১ বার জল সিঞ্চন করিতে হয়। পত্রের রং কালো হইলে এবং পত্রের বৃদ্ধি স্তব্ধ বা রহিত হইলে, তখন ক্ষেত্রে কিছুমাত্র জলের প্রয়োজন থাকে না। তখন সমস্ত ক্ষেত্রে একবার এরূপে নিড়াইয়া দিতে হইবে যেন প্রত্যেক গাছের মূল শিকড়টী বাদে আর সমস্ত পার্শ্ব শিকড় কাটিয়া যায়। তাহাতে তামাকের পাতা উত্তম রূপে প্রস্তুত হয়। ইহাকেই তামাকের পাইট্ কহে। বর্ষের গতিকে এই পাইট্ করিতে কখন অল্পকাল, কখন অধিককাল আবশ্যক হইয়া থাকে।

তামাকের চাস, পাইট্ ও তামাক প্রস্তুতীকরণ, এই তিনটী বিষয়েই অনেক কার্য্য এবং কার্য্যগুলি বেশ জটিল কুটিল। পাইট্ ও প্রস্তুতী করণ এই দুইটী কার্য্যে অগ্রহায়ণের শেষ হইতে ফাল্গুনের শেষ পর্য্যন্ত আবশ্যক হয়। ঐ দুইটী কার্য্যের মধ্যে প্রথমটী পৌষ মাসে বলিলাম, দ্বিতীয়টী মাঘ মাসে বলিব।

রুষের জারের মৃত্যু উপলক্ষে।

ধন মান কিছুই না রবে।
কালের কবল হ'তে রক্ষা নাই কোন মতে,
সকলেই কালের অধীন,—
রাজা প্রজা ধনী দুঃখী দীন।

এ সংসার রঙ্গালয় হয় কত অভিনয়
যাহেক না ভাবে মূঢ় মন—
যবনিকা হইবে পতন।
প্রভুত্ব সম্পদ বল যাবে সব রসাতল

কাল-চর্ব্বণেতে হবে চূর,
প্রমাণত রয়েছে প্রচুর।
মায়াতে জড়িত নর নশ্বর যে কলেবর
নিরন্তর হেরিছে নয়নে,
তবু ভোর সুখের স্বপনে।
এই যে রুষের জার' প্রবল প্রতাপ যার
অর্দ্ধেক ধরণীশ্বর যিনি!
ভেবে দেখ কোথা আজ তিনি?
লক্ষ লক্ষ সেনাগণে থাকিত যাহার সনে
প্রহরীস্বরূপ হায় হায়!
সে বীরত্ব রহিল কোথায়?
সে শরীর ধূলিসাৎ হইল যে অকস্মাৎ
বজ্রপাত 'জারিণার' * শিরে,
কার সাধ্য বারে নিয়তিরে?
শোকেতে মগন সবে চিরদিন নাহি রবে
আবার মাতিবে রাজ্য মদে,
দেখিয়াও শিখেনা বিপদে।
পদের গৌরব করি পরিণাম নাহি স্মরি
অভিমানে স্ফীত যেই জন,
কেবা ভ্রান্ত তাহার মতন?
এদশা দেখেও যার অসার যে এ সংসার
হেন জ্ঞান নাহয় উদয়,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ সে হৃদয়!
বিষয় বাসনানল দহিতেছে অবিরল
তবুও চেতনাশূন্য সবে,
দিব্য জ্ঞান হবে আর কবে?
ষড়্‌রিপু-মহাবল কালকূট-হলাহল
পিয়াইছে সংসার-মদিরা,
সাধে কিগো হয় দীপ্তশিরা!

* রুসিয়ার সম্রাট "জার," সম্রাজ্ঞী "জারিণা" এবং যুবরাজ "জারউইচ" বলিয়া বিখ্যাত।

অধোগতি দিনে দিনে পরমার্থ চিন্তা বিনে
পাপেতে মলিন সদা মন,
করিতেছে কুপথে গমন।
জাগাইতে মূঢ় জীব সাধিতে অশেষ শিব
বিধি করেছেন ভগবান,
শমন থাকিবে বিদ্যমান,—
গুরু হয়ে দিবে শিক্ষা; 'মৃত্যুমন্ত্রে'লও দীক্ষা,
উপেক্ষা না কর জীবগণ,
কেন—শেষে করিবে ক্রন্দন?
রাজৈশ্বর্য্য পদমান সব হবে তিরোধান
ভূরি ভূরি রয়েছে প্রমাণ,
না হারাও নিজ পরিত্রাণ।
বিবেক বৈরাগ্য ব্রত পালন কর নিয়ত
সংসারের অনিত্যতা হেরি,
শুভ কাজে নাহি কর দেরি?
লাভ হবে ধর্ম্ম ধন, কর ব্রত উদ্‌যাপন,
আলস্যে না কাটাও সময়,
পলে পলে আয়ু হয় ক্ষয়।
কালে কি করিবে তার বাসনা নিবেছে যার
হইয়াছে বৈরাগ্য উদয়,
সেকি মোহে বদ্ধ কভু রয়?
শোনে সে বিবেক বাণী দিব্যজ্ঞানে মহাজ্ঞানী
মহাভাবে সদা নিমগন,
ভেঙ্গে গেছে মোহের স্বপন।
জীবন্মুক্ত জীব হয়ে নিত্য চিদানন্দালয়ে,
মাতোয়ারা নিত্য মহোৎসবে
দীনভাগ্যে সে দিন কি হবে?
কোথা রাজ-সিংহাসন দারাসুত পরিজন
দাস দাসী পারিষদ-গণ,
সব ফাঁকি মুদিলে নয়ন!

শ্রীচ—

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

বিষ দোষ।

ছড়্‌ছড়ের মূল, ৮৷১০টী গোলমরিচ সহ জলে পিষিয়া সেবন করাইলে সর্প বিষ নষ্ট হয়। ইহা সেবনের কিছুকাল পরে দষ্ট ব্যক্তিকে ফটকিরির জল পান করিতে দিবে। যদি তাহাতে বমি হয়, তাহা হইলে বিষের হ্রাস হয় নাই বুঝিতে হইবে; এবং পুনরায় ঐ মূল পূর্ব্ববৎ সেবন করাইতে হইবে। সর্প বিষের ইহা উৎকৃষ্ট প্রতি-বিষ।

সর্প বা উন্মত্ত শৃগালাদিতে দংশন করিলে, তৎক্ষণাৎ যদি অস্ত্রদ্বারা চিরিয়া দষ্ট স্থান হইতে রক্ত শোষণ করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্থলেই ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না।

বিশুদ্ধ মুলতানি বনাত একটুকি কাঁঠালী কলার সহিত ভক্ষণ করিলে, অথবা প্রত্যহ কিছুদিন ধুতুরার মূল ২৷১ রতি পরিমাণে সেবন করিলে, উন্মত্ত শৃগালে ও কুক্কুর দংশনজনিত দোষ নিবারণ হয়। কলাইয়ের ডাল, মৎস্য ও শাক খাইতে নিষেধ।

আমরুল বাটিয়া খাইলে ছুঁচার বিষ যায়। মৌমাছি কামড়ান স্থানে কৃষ্ণ তুলসি পত্রের রস ও মধুর লেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

দষ্ট স্থানে পুনঃ পুনঃ তারপিন তৈল বা পাথরিয়া কয়লা লাগাইয়া দিলে, বৃশ্চিক, ভীমরুল, বোলতা ও মৌমাছির দংশনজনিত জ্বালা সত্বর নিবৃত্ত হয়। কর্পূরের ঘ্রাণ লইলেও বিষের জ্বালা নিবারণ হয়। ভিমরুল বা বৃশ্চিক দংশন স্থানে কাল কচুর আঠা মাখাইয়া দিলে, অথবা বকুল বিচি বাটিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়।

মাকড়সার গরলে কাঁচকলার আটা প্রত্যহ ৩৷৪ বার লাগাইলে ২৷৩ দিনে উপকার দর্শে।

কাঁচা হরিদ্রা, দুগ্ধে বাটিয়া গাত্রে মাখাইলে গরল আরোগ্য হয়।

সর্পদষ্ট স্থানে কাষ্টকি উত্তমরূপে ঘসিয়া দিলে অত্যন্ত উপকার হয়। দষ্ট ব্যক্তিকে লঙ্কাপাতা খাওয়াইলেও উপকার হয়।

পুনর্ণবা, প্রিয়ঙ্গু, টগরবৃক্ষ, শ্বেতবৃহতী, কুষ্মাণ্ড ও অপরাজিতা, ইহাদের মূল জলের সহিত বাটিয়া ঘৃত মিশাইতে হইবেক। যে ব্যক্তি সর্প দংশনে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে, তাহার অঙ্গে লেপন করিয়া দিলে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করে। সর্পে দংশন করিবামাত্র উষ্ণ ঘৃত পান করিলে কিম্বা দংশনের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধভাগে তাগা বাঁধিলে আর বিষ বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

কেলে কড়ায় পাতা হুকার জলে বাটিয়া গরলের উপর মর্দ্দন করিলে ভয়ঙ্কর গরল রোগ হইলেও আরোগ্য হয়।

হিঙ্গু জলের সহিত গুলিয়া দংশন স্থানে লেপন করিলেও বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়।

পাথুরিয়া কলিচুণ চিতে সাপে চাটা স্থানে লাগাইয়া দিলে, বিষ উঠিয়া যায়।

শ্বেত করবীর শিকড় ৵০ আনা, শ্বেত জবাফুলের শিকড় ৵০ আনা ইসার মূল ৵০ আনা একত্রে বাটিয়া কাঁচা দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া খাইলে, সাপে কাটা আরোগ্য হয়।

শ্বেত অপরাজিতার মূল ও দে ধানের মূল একত্র জলের সহিত পেষন করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে কালদষ্ট ব্যক্তিও জীবিত হইয়া থাকে।

রাখাল শশার মূল, শ্বেত পুনর্ণবা, কাকুড়লতার মূল, তালমুলী অথবা আপাঙ্গের মূল তণ্ডুলোদকের (চলুণির) সহিত ভক্ষণ করিলে সর্প বিষ বিনষ্ট হয়।

আকুনাদির মূল তাহার রসে পেষণ করিয়া পান করিলে, কালকূট বিষ বিনষ্ট হয়।

অপরাজিতার মূল ঘৃতের সহিত পান করিলে চর্ম্মগত বিষ, দুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তগত বিষ, কুড় চূর্ণের সহিত পান করিলে মাংসগত বিষ, হরিদ্রার সহিত পান করিলে অস্থিগত বিষ, কাকোলীর সহিত পান করিলে মেদগত বিষ, পিপ্পলীর সহিত পান করিলে মজ্জাগত বিষ, এবং চাণ্ডালী (লতা বিশেষ) মূল চূর্ণের সহিত পান করিলে শুক্রগত বিষ নষ্ট হয়।

শ্বেত আকন্দের মূল কিম্বা রক্তচিতার মূল ও ইন্দ্র গোপ কীট একত্র পেষণ করিয়া সর্প দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

আকুলা কাঁটা নটে গাছের শিকড়, বাসি হুঁকার জল ও হলুদ একত্র বাটিয়া গরলে লাগাইলে তিন দিবসে রোগ ভাল হয়।

৪ তোলা প্রমাণ তেঁতুল ও গৃহের ঝুল পুরাতন ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক সপ্তাহ লেহন করিলে ইন্দুরের বিষ নষ্ট করে।

সর্ষপ, কুঙ্কুম, তক্র ও ঘৃত, সমভাগে লইয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ মূষিক-দংশন-জনিত জ্বালা নিবারণ হইয়া থাকে।

ঘৃতকুমারীর পত্র সৈন্ধবলবণের সহিত পেষণ করিয়া উত্তপ্ত করত উন্মত্ত কুক্কুরে দষ্ট স্থানে বন্ধন করিয়া দিনত্রয় রাখিয়া দিবে, তাহাতে বিষপীড়া নিবারণ হয়।

গুড়, তৈল, ও আকন্দের দুগ্ধ একত্র পেষণ করিয়া দংশন স্থানে লেপন করিলে কুক্কুর দংশন জন্য বিষপীড়া নিবারণ হয়।

রক্ত নটিয়ার মূল ও তুলসীর মূল, চাউলের জলের সহিত পান করিলে কীট-দংশন জনিত বিষ দূর হয়।

করঞ্জাবীজ, শ্বেত সর্ষপ ও তিল একত্র

পেষণ করিয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিলে কীট দংশন জনিত বিষ দূর হয়।

নিম্ববৃক্ষের ও শমীবৃক্ষের ছাল একত্রে উক্তোদকের সহিত পেষণ করিয়া দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে, ব্যাঘ্রাদির নখ ও দন্তবিষ নিবারিক হয়।

বৈইচ গাছের ছাল অর্দ্ধতোলা, তেলাকুচায় শিকড় অর্দ্ধ তোলা, একসঙ্গে বাটিয়া খেপা শিয়ালে কামড়ান রোগীকে খাওয়াইলে রোগী আরাম হয়।

(ক্রমশঃ)

স্বর সাধন প্রণালী।

(৩৫৮ সংখ্যা ২০৯ পৃষ্ঠার পর)

আলেয়া—আড়াঠেকা। *

গীতসার সংগ্রহ। নবীনচন্দ্র দত্ত কৃত গীত ও স্বরলিপি।

। ১। । +। । ৩। ৺
প প ধ সা; ঋ ধ প
এ- স প্রাণ গৌ- রী, কে- ম

৺ ০। । ১। । +। ৺ ৺
ম গ ঋ ঋ গ প ম প
নে ছি লে মা- গো, মা- মে রি

৩। । ০।
গ ঋ সা
পা- স রি।

। ১। । +।
গা সা ম ম
উ- ভা- পে ঘে-

। ৩। । ০। । ১॥ +। । ৩।
প প ধ ধ সা ঋ ঋ সা নি
মে- ছে উ- মা, আ- হা- ম- রি ম-

। ০। । ১। । +। । ৩।
ধনি প প প ধ সা; ঋ ধ
রি । এ স প্রাণ গৌ- রী, অ-

* অর্দ্ধ শব্দের বিকৃতি আড়। অর্দ্ধ দ্বি শব্দের অপভ্রংশে আড়াই হয়, সেই আড়াই হইতে আড়া হইয়াছে। যেখানে দুই মাত্রা ক্রমে প্রস্বন হইয়া পদ বিভাগ হয়, তথায় প্রত্যেক পদের প্রথম মাত্রা ত্যাগে দ্বিতীয় মাত্রায় তালি দিলে, তাহাকে আড়ে তালি দেওয়া কহে। কাওয়ালীর গান আড় করিয়া গাইলে আড়াঠেকার উদ্ভব হয়, অতএব আড়ারও মাত্রা সমষ্টি কাওয়ালীর ন্যায় ১৬টী হ্রস্ব বা ৮টী দীর্ঘ। মধ্যমানের এক ফের মধ্যে আড়া ছন্দের দুই ফের পাওয়া যায়। কাওয়ালীর সহিত ঢিমে তেতালার যে সম্বন্ধ, আড়ার সহিত মধ্যমানেরও সেই সম্বন্ধ। মধ্যমানের মাত্রা সমষ্টি ১৬টী দীর্ঘ কিম্বা ৩২টী হ্রস্ব মাত্রা। (গী, স্ব, সা)। আড়া-ঠেকার ঠেকা যথা,—

৺ ৺ । ১৺ ৺ । +। ৺ ৺ ৩৺ ৺ । ০।
তা ধিন | তা ধিন্ | ধিন্ তা ধিন | ধিন্ তা | তিন

। ।১। । ।। +।। । ।৩। । ।। ০।।
বা, তা ধিন | তা ধিন্ | ধিন্ | তা ধিন্ | ধিন্ তা | তিন |

(ক্রমশঃ)

৺	৺	০।	।	১।	।	+।	৺	৺	৩।	।	০।
প	ম	গ	ঋ	ঋ	গ	প	ম	প	গ	ঋ	সা
স-	ছ	শ-	রৎ	কা-	লে	হ-	ন	ত্রি	পু-	রা-	রি ।

	।	১।	৺	৺	+।	।	৩।	।০।
	প	প	ধ	সা˙	ঋ.	সা˙	সা˙	সা.
(১ম বার)	শ্রা-	ন্তা	হ-	য়ে-	ছে	ত-	ন-	য়া,
(২য় বার)	কো-	থা	গে-	লে	গি-	রি	নি-	র্দ্দয়,
(৩য় বার)	কি	ক-	রি-	ব	পা-	গল	জা-	মাই,
(৪র্থ বার)	এ-	কি	সয়	মা-	য়ে-	র	প্রা-	ণে,

	।	১।	।	+।	।	৩।	। ০।
	ধ	নি	সা˙	ঋ০	সা˙	নি	ধ নিপ
(১ম)	ব্য-	জন	ক-	র	বি-	জ-	য়া,
(২য়)	ক্ষু-	ধারি	হ-	য়ে-	ছে	স-	ময়,
(৩য়)	অলং-	কার	দি-	য়ে	ছেন	ছা	ই,
(৪র্থ)	ক-	ন্যা	দে-	ওয়া	নি-	গু	ণে,

।	১॥	+।	।	৩।	।০।	।	১॥	+।	।	৩।	। ০।
প	প	ম	ম	প	ধ	সা˙	ঋ˙	ঋ˙	সা˙	নি	ধ নিপ
আ-	ন	আ-	ন-	জ-	য়া,	আ-	ন	কো	লে	ক-	রি ।
যা	তো-	মার	সা-	ধ্য	হয়,	আ-	ন	ত্ব	রা	ক-	রি ।
ব-	স-	নের	বি-	ষয়	নাই,	এ-	ম-	ন	ভি-	খা-	রি ।
কে-	বল	দি-	লাম	তোমা	ধনে,	কু-	লীন	দে	খে	ভা-	রি ।

পারিবারিক সঙ্গীত।

সাধুচরিত।

চৈতন্য।

কীর্ত্তন।

প্রেমিক সন্ন্যাসী তিনি প্রেমের মহাজন। আচণ্ডালে নাম সুধা করেন বিতরণ। (প্রেম রসে বিভোর হয়ে হে) বলিছে শ্রীমুখ দিয়া, নামে রুচি জীবে দয়া, দুই বাহু পসারিয়া করে আলিঙ্গন। (হরি বলে কোল দেয়রে, প্রেমে পাগল হয়ে) (ভেদাভেদ নাই তাররে, উচ্চ নীচ বলে) নাহি কোন শাস্ত্র বিধি, নাম মন্ত্র যপ যদি, পার হবে ভবনদী নামের গুণ এমন। (নাম যপে তরে গেলরে, মহাপাপী সবে) মধুরভাবে মধুর নব অনুরাগে চিদানন্দ রসপানে সদানন্দ মন। (প্রেম যোগের যোগিরাজ হে, ভক্ত শ্রীচৈতন্য)

কা. ঘোষ।

রাজা রামমোহন রায়।*

বাহার—মধ্যমান ঠেকা।

জানিনে কে ভূলোকে এসেছিলে, হে।

নইলে এতগুণ কি একাধারে, মনুষ্যে হইতে পারে, বিদ্যাতে সর্ব্বত্র পূজ্য কি জন্য, জলধি পারে;—পুরাণে শুনি একবার, হয়েছিল বেদউদ্ধার, কর্‌লে তার তত্ত্ব বিস্তার, এ কোন্ অবতারের লীলে।

ছিল জগৎ অন্ধকারে, উজ্জ্বল করিলে তারে, ব্রহ্মনামে ধরাধামে মাতিলে মাতাইলে;—হ'লে জ্ঞান কল্পতরু, উর্ব্বর করিলে মরু, ধন্যতুমি জগৎ-গুরু, প্রণমি সবে মিলে।

কি হিন্দু কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খ্রীষ্টান, চরম ধরম তত্ত্ব বিচারে হারাইলে;—তোমার, নাম রাজা রাম মোহন রায়, চির দিন রবে ধরায়, বিলালে জ্ঞান ধন সর্ব্বত্র, পাত্র না-বিচারিলে।

শ্রীবিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

* সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে রচিত।

হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।

(৩৫৮ সংখ্যা-২২৪ পৃষ্ঠার পর)

রমণীগণের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, সংসারের কার্য্যকলাপ যাহাতে সুশৃঙ্খল হয় তাহার ব্যবস্থা করা। অবস্থা যাঁহার যেরূপই হউক না কেন, নারী যদি গৃহ কর্ম্মে সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা হয়েন, তাহা হইলে বন্য কুটীরও গৃহস্থ আলয় হইয়া উঠে এবং সেই জন্যই বোধ হয় "ন গৃহম্ গৃহমুচ্যতে গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" এই বাক্যের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। গৃহের জিনিষ পত্রাদি সুশৃঙ্খল ও পরিষ্কাররূপে রক্ষা করা, যখন যে জিনিষ আবশ্যক হয় তখন তাহা ঠিক্ স্থানে প্রাপ্ত হওয়া, গৃহপ্রাঙ্গন সুপরিষ্কৃত রাখা এবং প্রাতে ছড়াঝাঁট দেওয়া যাহাতে হয় তাহা করা বিশেষ আবশ্যক, কেন না সমস্ত দিবস ও রাত্রির প্রস্রাব, এঁটো ও বালক বালিকাগণের মলত্যাগাদির স্থান হইতে যে দুর্গন্ধ জন্মে, টাট্‌কা গোময় জলে গুলিয়া প্রাঙ্গণ, আস্তাকুঁড় ও পথাদিতে ছড়া দিলে সেই দুর্গন্ধ সকল বিনষ্ট হয়, (কিন্তু এখন আর গৃহিণীগণ এ সকল কার্য্যে মনোযোগ করেন না, বাবুদের বাবুগিরির ঢেউ অন্তঃপুরে লাগিয়াছে, তাই স্ত্রীগণের বাবুগিরি, বিলাসিতা, সৌখীনতা ও শ্রমকাতরতা দর্শন করিলেপ্রাণে এক প্রকার হতাশার ছায়া পড়িয়া ক্ষোভ কালিমায় হৃদয় কলুষিত এবং জীবনটাকে অবসন্ন ও নিরুৎসাহ করিয়া ফেলে।) সন্ধ্যার সময় ঝি এক একটী আলো সকল ঘরে দিয়া গেল, আলো দিতে বিলম্ব হইলে 'ঝি! আলো দিয়া য়,' এই চিৎকার গৃহিণীর চরম চেষ্টা হওয়া উচিত নহে, সন্ধ্যা হইলে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালা,

গন্ধক ও ধুনার ধুঁয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গৃহে যদি মশক, আরশুলা, চামচিকা প্রভৃতি থাকে, তাহা হইলে আলো ও ধোঁয়ায় তাহারা উত্ত্যক্ত হইয়া বাহির হইয়া যায় এবং গৃহের দূষিত বায়ু বিনষ্ট হয়। গৃহে রসুয়ে ও চাকর চাকরাণী রাখাই দোষের, একথা আমরা অবশ্যই বলিতেছি না; আপনার ন্যায্য খরচ চালাইয়া আত্মীয় স্বজনের ভরণ পোষণে কোনও কষ্ট না দিয়া, অতিথি ও দীন কাঙ্গালীকে তাহাদের প্রার্থিত একমুষ্টি অন্ন প্রদান করিয়া, পারেন ত চাকর চাকরাণী ও রসুয়ে রাখুন, কিন্তু তাহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্যে যদি অবহেলা ও অযত্ন করে, কিম্বা ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে নিজেই গৃহকার্য্যাদি করা ভাল। অবশ্য অন্যান্য স্ত্রী পরিজনগণ গৃহ-কার্য্যে আপনার সাহায্য করিবেন। আর যদি গৃহধর্ম্ম পালনোপযোগী ব্যয় কুলাইয়া চাকর চাকরাণী ও রসুয়ে রাখিতে পারেন ও তাহারা আপনার ও পরিজনগণের মনোনীত হয়, তাহা হইলেও বসিয়া শুইয়া তাস খেলিয়া গল্প করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা নিতান্ত অনু-চিত। বডি, কামীজ, সেমীজ, কম্ফর্টার তোয়ালে, গামোছা, দোপাট্টা, বিছানার চাদর, কার্পেটের জুতা, লেপ, তোষক গদি, উপাধান ও তাহার আবরণ এবং ছেলেদের পোষাক প্রভৃতি প্রস্তুত করা শিক্ষা করিয়া সেলাইয়ের কল, সূচি ও কাঁটা দ্বারা প্রস্তুত করিলে সংসারে অনেক খরচ বাঁচিয়া যায়। ঈশ্বর না করুন, রমণী বিধবা হইয়া দুরবস্থায় পড়িলে অর্থের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়ে, সেই সময় নানাবিধ শিল্প কার্য্য দ্বারা রমণীগণ স্বচ্ছন্দে নিজ জীবিকার উপায় করিতে পারেন, একার্য্য অনিন্দিত ও হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত।* যাঁহারা রসুয়ে নহিলে জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ অথবা প্রভূত অর্থ আছে বলিয়া রন্ধনের কষ্ট লইতে অস্বীকৃত, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা খাদ্য দ্রব্যাদির তত্ত্বাবধান করেন। বিড়ালে খাওয়া, কুকুরে খাওয়া,† কাকে ঠোকরান, মনুষ্যশূন্য ঘরে অধিকক্ষণ আলগা থাকা, খাদ্যের তাপ বাহির হইতে না পারিয়া চাকুনি ঘামিয়া পড়া জিনিষ, ডেয়ে পিপীলিকা লাগা ও অপরিষ্কার খাদ্য কি আত্মীয় পরিবার, কি অতিথি, কি চাকর চাকরাণী কাহাকেও খাইতে দেওয়া উচিত নহে। বিশুদ্ধ জল ও বায়ু মনুষ্যের জীবনের ও স্বাস্থ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়, সুতরাং ব্যবহারের জলটা যাহাতে সুপরিষ্কৃত হয়, তাহার চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক। জল বিশুদ্ধ করার কয়েকটী সহজ উপায় আছে। (১) উচ্চ ছাদে পরিষ্কার গামলা বা জালা পাতিয়া রাখিলে যে বৃষ্টির জল

* "বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জীবেন্নিয়মমাস্থিতা। প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ॥"

† পূর্ব্বে কুকুর ঘরে গেলে হিন্দুগণ হাঁড়ি ও জলের কলসী ফেলিয়া দিতেন, কিন্তু অধুনা বিলাতী কুকুর গৃহস্থের একটী সখের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পতিত হয় তাহা, বিশুদ্ধ জল। বৃষ্টি-কালে প্রাঙ্গণে চারিখানি খুঁটি পুঁতিয়া তাহাতে এক খানি কাপড় টাঙ্গাইয়া সেই কাপড়ের ঠিক মধ্যস্থলে একটী নুড়ি রাখিয়া দিবে এবং তাহার নীচে উচ্চ একখানি জলচৌকি বা টুলের উপর খড়ের বিড়া পাতিয়া তদুপরি কলসী বা গামলা বসাইয়া দিলে বিশুদ্ধ পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। কিন্তু এই জল অধিক দিন রাখিয়া ব্যবহার করা যায় না, কারণ অধিক দিন হইলে পোকা জন্মে। জলে প্রথম যখন পোকা জন্মে তখন সেগুলি এত ক্ষুদ্র যে চক্ষুর অগোচর—অণুবীক্ষণ ব্যতীত দেখা যায় না। সকল গৃহস্থের বাড়ীতে অণুবীক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু তবুও ঐ পোকা দেখিবার একটী সহজ উপায় আছে, সে উপায়টী এই,—নির্ব্বাত বা অল্প বায়ু যুক্ত স্থানে একটী পরিষ্কার কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল ঢালিয়া টেবিলের উপর অথবা কোন উচ্চ ও আলোক যুক্ত স্থানে রাখিয়া দিলে যখন জলটা বেশ স্থির হইবে, সেই সময় যদি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ ঐ জলের উপর নীচে ভাসিয়া ভাসিয়া নড়িয়া বেড়ায়, তাহা হইলে জানা যায় পোকা জলে জন্মিয়াছে। যদিও ঐ ক্ষুদ্র পোকা গুলি জলের ময়লার ন্যায় দেখায়, তথাপি বুঝিতে হইবে যে পাত্রস্থ জল স্থির হইলে ময়লা জলের নীচে পড়া সম্ভব, নীচে উপর নড়িয়া বেড়াইবে কেন? যখন জানা যাইবে যে জলে ঐরূপ পোকা জন্মিয়াছে তখন স্নান, পান ও রন্ধন করিবার জন্য আর সে জল ব্যবহার করিবে না। (২) জলে ফট্‌কিরি দিলে জল পরিষ্কার হয় এবং নির্ম্মলী ঘসিয়া দিলেও জল পরিষ্কার হয়। (৩) ফিল্টার—ফিল্টর ক্রয় করিবার সুবিধা না হইলে মাটীতে কাঠের বা বাঁশের ফ্রেমে জল ফিল্টার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিরূপে ইহাতে জল বিশুদ্ধ করা হয়, তাহা বোধ হয় এখন অনেক গৃহস্থই জানেন সুতরাং তাহা লেখা বাহুল্য। গৃহিণীর লেখা পড়া শিক্ষা করা আবশ্যক এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অত-এব নভেল নাটকের পরিবর্ত্তে 'শরীর পালন' 'স্বাস্থ্যরক্ষা' 'ধাত্রীশিক্ষা' এবং এ শ্রেণীর অন্যান্য পুস্তক গুলি মনো-যোগের সহিত গৃহিণীর পাঠ করিয়া যাহাতে পারিবারিক স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন ও ধাত্রীশিক্ষা লিখিত ঔষধ গুলি আনাইয়া গৃহে রাখিবেন। এইরূপে যাহা কিছু সংসারে আবশ্যকে লাগে, তাহা যত্নে সংগ্রহ করিবেন এবং যত্নের সহিত ও হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহকার্য্য গুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবেন এবং আয়োচিত ব্যয় করিবেন, হিন্দু শাস্ত্রকারগণও ইহাই রমণীর কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া গিয়া-ছেন—যথা "সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহ-কার্য্যেষু দক্ষয়া। সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়েচামুক্তহস্তয়া॥"

ঈশ্বরের নীচেই স্বামী রমণীগণের আরাধ্য ও প্রিয় হওয়া কর্ত্তব্য। গার্হস্থ্যধর্ম্ম-পালনের প্রধান সহায় স্বামী। স্ত্রী ও স্বামী উভয় মিলনের মহান উদ্দেশ্য ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মচর্য্যার জন্য পবিত্র বিবাহ বন্ধন আবশ্যক। হিন্দুর বিবাহ যে কেবল মাত্র ধর্ম্মমূলক, তাহা "কুমার সম্ভব কাব্যে সপ্তম সর্গের 'বধূং দ্বিজঃ প্রাহ তবৈষ-বৎসে! বহ্নিবিবাহং প্রতি কর্ম্মসাক্ষী। শিবেন ভর্ত্রা সহ ধর্ম্মচর্য্যা কার্য্যা ত্বয়া মুক্ত বিচারয়েতি॥" এই শ্লোকটী পাঠে জানা যায় এবং অন্যান্য প্রমাণও আছে কিন্তু তাহা উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। যাহাহউক "নারায়ণাৎ পরং কান্তং ধ্যায়তে সততং সতী। তদাজ্ঞা রহিতং কর্ম্ম নৈব কুর্য্যাৎ কদাচন॥" এই কথাটী স্মরণে রাখিয়া সর্ব্বদা স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা রমণীর কর্ত্তব্য। যে গৃহে স্বামী স্ত্রীতে সদ্ভাব নাই, সে গৃহ ত শ্মশানহইতেও ভীষণ, তাহাতে আবার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কিসের? পতি যদি অসচ্চরিত্র হয়েন তাহা হইলে তাঁহাকে ঘৃণা করা কখনও কর্ত্তব্য নহে, তাঁহাকে জগৎ ঘৃণা করে করুক, কিন্তু স্বামী কোন অবস্থায় পত্নীরঘৃণার পাত্র নহেন; অসচ্চরিত্র পতিকে সচ্চরিত্র করাই সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য, কেন না "সংস্মরন্তমপিপ্রেতং বিষমেষেক পাতিনম্। ভার্য্যেবাম্বেতি ভর্ত্তারং সততং যা পতিব্রতা॥" ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ। তদ্বদ্ভর্ত্তারমাদায়-তেনৈব সহ মোদতে॥" স্বামীকে ভোজ্য, ভক্ষ্য, পেয়, সরল ব্যবহার, অকপট প্রণয় ও সুমিষ্ট বচন দ্বারা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট করিবে এবং ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিবে; স্বামীর সুখ, নিজের সুখ, স্বামীর দুঃখ নিজের দুঃখ, স্বামীর নিন্দা নিজের নিন্দা ও স্বামীর মঙ্গল নিজের মঙ্গল বলিয়া মনে করিবে। নিজের জন্য পতিকে কখন কায়মনো-বাক্যেও ক্লেশ প্রদান করিবে না; পতি যাহাতে লোকসমাজে নিন্দনীয় হয়েন, তেমন কার্য্যে পতিকে নিযুক্ত করিবে না; পতির সৎকার্য্যের সহকারিণী হইবে; অকারণে সর্ব্বদা নিজের নিকট আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার সমুচিত চিন্তাশীলতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণাতর ব্যাঘাত জন্মাইবে না; নিজে সর্ব্বদাই পতিধ্যান, পতি জ্ঞান, পতি ভালবাসা হৃদয়ে জাগরুক রাখিবে; কিন্তু পতি যাহাতে স্বীয় কর্ত্তব্যগুলি যত্নের সহিত পালন করিয়া অবসর মত তোমাকে ভাল বাসেন তাহার চেষ্টা করিবে। বিখ্যাত শ্রদ্ধেয় কবি বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "রাজা ও রাণী" তে এবিষয়ে দুইটী স্ত্রী চরিত্র অতি সুন্দর অঙ্কিত করিয়াছেন, ঐ দুই স্ত্রী চরিত্র হিন্দু রমণীগণের অবশ্য অনুকরণীয়। ইলা একস্থলে কুমারকে বলিতেছেন— "আমি দিবানিশি তোমায় ভালবাসিব, তুমি অবসর মত বাসিও; আমি সারা নিশি তোমার লাগিয়া হেথায় বসিয়া রহিব, তুমি অবসর মতে আসিও।" হেথায় বসিয়া থাকার অর্থ হৃদয় সর্ব্বক্ষণ

তবধ্যানে নিমগ্ন থাকিবে। এইরূপ পতিভক্তিই—প্রকৃত পতিভক্তি, ইহাই প্রকৃত পতিব্রতার ধর্ম্ম। পুরুষের সংসারে অনেক কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিয়া—দশদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংসার পথে বিচরণ করিলে, "দশ দশা" বহিবার জন্য মস্তক পাতিয়া থাকিলে তবে ত পৌরুষ। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সর্ব্বদা রমণীর অঞ্চল ধরিয়া বসিয়া থাকিলে, চিন্তাকে স্বাধীনভাবে চারিদিকে বিচরণ করিতে না দিলে, বিশ্বে প্রেম বিস্তৃত করিতে না দিলে তিনিত স্ত্রৈণ নামে অভিহিত হইবেনই। আরও তাঁহার মাতাকে পুত্রপ্রসবিনী না বলিয়া মাংস-পিণ্ড প্রসবিনী অথবা বন্ধ্যা বলিলেও ক্ষোভ মিটিবে না—সুতরাং স্বামীকে নাক-ফোঁড়া বলদ না করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যের সহায়তা করা ও কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া রমণীর কর্ত্তব্য। উক্ত গ্রন্থের নায়িকা রাণী সুমিত্রার স্বামী রাজা বিক্রম দেব স্ত্রৈণ্যতা পরবশ হইয়া যখন স্বীয় কর্ত্তব্য রাজ্যপালন পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি অন্তঃপুরে অবস্থান করিতেন, তখন রাণী সুমিত্রা বড়ই ব্যথিতহৃদয় হইতেন। বাস্তবিক সংসারের প্রিয়তম বস্তুতে কোনও খুঁৎ আছে জানিতে পারিলে প্রাণে বড়ই বেদনা অনুভূত হয় এবং সেই খুঁৎ নিখুঁৎ করিবার জন্য প্রাণ ব্যগ্র হইয়া উঠে। তাই রাণী সুমিত্রা রাজা বিক্রম দেবকে তাঁহার কর্ত্তব্য রাজ্য সুপালনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন—রাজ্যে অরাজকতাজনিত অনাহারী ও অত্যাচার প্রপীড়িত প্রজাগণের হাহাকার ধ্বনি রাজার কর্ণগোচর করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য রাজ্য সুপালনের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন—কিন্তু কিছুতেই কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন, স্ত্রৈণ রাজার জ্ঞানোদয় হইল না, বরং উহাতে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন সুমিত্রা দেবী মনে ভাবিলেন যে তিনি কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরিত না হইলে রাজা স্বকর্ম্মে মনোযোগ দিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি গোপনে ছদ্মবেশে পিতৃভবনে গমন করিলেন। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে সুমিত্রা স্বামীকে ভাল বাসিতেন না, সুমিত্রার ভালবাসা সাধারণ রমনীগণের ভালবাসা অপেক্ষা অনেক উচ্চ, সুমিত্রা পতি বিরহিতা হইয়া পতির বিরাগভাজন হইবার ভয় না করিয়া স্বামীকে কর্ত্তব্য পথে লইবার জন্য পাগল! এইরূপ কার্য্যই প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য। অতএব স্বামীর কর্ত্তব্যপথের কন্টক হওয়া কখনই সহধর্ম্মিণীর উচিত নহে।

কু. রা।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। অষ্ট্রীয়ার সম্রাজ্ঞী ভারত ভ্রমণে ইচ্ছা করিয়াছেন।

২। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ দানশীলা শ্রীযুক্তা বাই দীনবাই বোম্বেতে একটী টাউনহল ও একটী পুস্তকালয় স্থাপনের জন্য ৭ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। গবর্ণমেন্ট বাটী নির্ম্মাণের জন্য জমি দিবেন।

৩। মহারাণী ভারতেশ্বরী মুন্সী আবদুল করিমকে বড়ই ভাল বাসেন। ইঁহার নিকটেই তিনি হিন্দীভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। সে দিন মহারাণী যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া মুন্সী আবদুল করিমের বাটীতে গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

৪। পৃথিবীতে সাড়ে এগার কোটী লোক ইংরাজীতে কথা কহিয়া থাকে। পৃথিবীতে প্রতি বৎসর প্রায় ১৮ হাজার লোক আত্মহত্যা করে ও দশ লক্ষ অন্ধ আছে।

৫। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ডিউক অব এডিনবর্গ জন্মাইলে রেজেষ্টারি আফিসে খবর দিতে ভুলিয়া যান। ছয় সপ্তাহের পর এই ভ্রম ধরা পড়ে, তখন জন্মের তারিখ রেজেষ্টরি না করার জন্য ৭ শিলিঙ ৪ পেন্স জরিমানা হইয়াছিল।

৬। রুসের মেমাচিন সহরে কেবল পুরুষদিগের বসবাস, একটীও স্ত্রীলোক নাই। পৃথিবীর আর কোনও স্থলে এরূপ রমণীশূন্য নগর নাই।

৭। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এডিসন সাহেব বিদ্যুতের সাহায্যে এমন এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন যে, তাহাতে মনুষ্যের অঙ্গচালনা ঠিক্ রক্ষিত হইবে। ফনোগ্রাফে যেমন মানুষের কথা ধরিয়া রাখা হয়, এই যন্ত্রে সেইরূপ অঙ্গচালনা ও নৃত্য ধরিয়া রাখা যাইবে। যন্ত্রের নাম হইয়াছে 'ফিনোটেস্কোপ।'

৮। চিন-জাপানী যুদ্ধে চিনেরা সন্ধি স্থাপনে ব্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু জাপানীরা জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া আরও যুদ্ধ চালাইতে অগ্রসর। সম্প্রতি তাহারা মেটিনলিং আক্রমণ করিতে গিয়া চিন সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত ও বিতাড়িত হইয়াছে।

৯। ঘোরতর যুদ্ধের পর জাপানীরা আর্থর বন্দর অধিকার করিয়াছে। চীন দূত জাপানে সন্ধি প্রস্তাব লইয়া যান। জাপানীরা সমুদায় যুদ্ধের ব্যয় ছাড়া প্রায় শতকোটী মুদ্রা চাহিতেছে

১০। জাপানের নারীগণ রণোৎসাহে উন্মত্ত হইয়াছে। এক দল স্ত্রীলোক জাপান সম্রাট মিকাডোর নিকট চিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার প্রার্থিনী হয়। সম্রাট তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া আহত যোদ্ধাদিগের শুশ্রূষা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

১১। রাজকুমারী আলিক্সের (আলেকজান্দ্রা ফিওডোভ্‌না) সহিত নব রুশীয় সম্রাট্ নিকোলাসের শুভবিবাহ শীত প্রাসাদের নিভৃত ধর্ম্মমন্দিরে বিনাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়াছে। সম্রাট এই শুভানুষ্ঠানের স্মরণার্থ এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া দীন দরিদ্র ও কারাবাসীদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

১২। রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন অমৃতসরের শিখদিগের স্বর্ণমন্দির দর্শনে গমন করিয়া ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১৩। জর্ম্মণ ভীষ্মদেব প্রিন্স বিসমার্ক বৃদ্ধবয়সে স্ত্রীহীন হইয়াছেন।

১৪। ইংলণ্ডেশ্বরী নব জারকে রাজকীয় স্কট গ্রে সৈন্যের কর্ণেল পদ দিয়াছেন। ইংলণ্ডের যুবরাজও রুসিয়েশ্বর কর্ত্তৃক এইরূপ সম্মানিত হইয়াছেন।

১৫। কুমারী কর্ণিলিয়া সোরাবজী একটী পারসী যুবতী। বিলাত হইতে বারিষ্টার হইয়া বরদারাজ্যে ওকালতী করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম স্ত্রী-বারিষ্টার।

১৬। দক্ষিণ আমেরিকার পাটাগোনিয়াবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি এবং লাপলণ্ডবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি। তথাপি অন্যজাতির মধ্যে এক একটী অদ্ভুত মনুষ্য দেখা যায়। স্কটলণ্ডের কনাম নামক এক সাহেব দীর্ঘে ১১॥ ফুট, তাঁহার মত দীর্ঘাকার মনুষ্য পৃথিবীতে দৃষ্টিগোচর হয় না। আর হলণ্ডের ১৮ বর্ষীয় এক যুবতী দীর্ঘে ২০ বুরুল মাত্র, ইহাঁর মত ক্ষুদ্রাকারও বোধ হয় আর নাই।

১৬। সাবিত্রী লাইব্রেরীর ১৪শ সাংবৎসরিক অধিবেশন সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন এবং বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ "বাঙ্গালার অভাব ও অবস্থা" বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই পুস্তকালয়ের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

বামা রচনা।

নিরাকাঙ্ক্ষী।

১

কি চাহিব প্রিয়তম,
এ মর-হৃদয়ে মম,
কামনা, বাসনা, সাধ, কিবা অপূরণ ?—
দাসীরে দয়াল বিধি
দিতেছেন যেই নিধি,
স্বরগ মরতে প্রভো, কি আছে তেমন ?

২

চাহি না, রক্তিম ছবি,
উষার বালক রবি,
শারদ সন্ধ্যার শশী রজত বরণ ;
চাহি না তারকা কুল,
প্রকৃতির হীরা ফুল,
চাহি না, বাসব ধনু বা যা গগণ।

৩

চাহিনা বাসন্ত বায়,
অমিয়া ছড়ায়ে যায়,
সুকণ্ঠ দোয়েল-কণ্ঠে মধুমাখা গান;
চাহিনা কুসুম-রাণী
আধেক ঘোমটা টানি,
দেখায় সে হাসি-মাখা, আধেক বয়ান!

৪

চাহিনা বকুল-তলে,
প্রজাপতি দলে দলে,
সাটিন পোষাক পরি, বেড়ায় নাচিয়া;
চাহিনা শুনিতে সুখে,
শ্যাম ভ্রমরের মুখে,
বসন্ত বাহারে বীণা উঠিছে বাজিয়া।

৫

চাহিনা সুমেরু-গা'য়
স্বর্ণ গঙ্গা বহি যায়,
দ্রবীভূত হেম স্রোতঃ স্বর্গ হ'তে আসে,
চাহিনা, তাহার পরে
দেখি চারু শশধরে!—
বসি সে সুবর্ণ শৈলে চন্দন বাতাসে!

৬

চাহিনা নন্দন বনে
দেবের বালিকা সনে,
বসিয়া মন্দার-ছায় গাঁথি ফুলমালা;
সেথা মন্দাকিনী-জলে
স্ফুট স্বর্ণ শতদলে,
চাহিনা করিতে খেলা মিলি সুরবালা!

৭

চাহিনা, করিনা আশ,
অলকা অমরা বাস,
যক্ষের ভাণ্ডারে যত অমূল্য রতন;
রাজ্য কিবা মহারাজ্য,
নাহিক আমার কার্য্য,
ধন মান যশে মম কিবা প্রয়োজন?

৮

কি চাহিব, সবি তুচ্ছ—
তুমিই মহান্‌ উচ্চ,
তোমা বিনা ছাই ভস্ম কি করিব আশা—
তুমি দেব, প্রাণারাম,
স্মরণে সফল কাম,
তব স্মৃতি কোটী স্বর্গ, অমর-পিপাসা!

৯

যে ক'দিন বেঁচে থাকি,
যেন গো তোমারে ডাকি,
যোগী যথা যোগীশেরে করে আরাধনা;
দিয়ে শত অশ্রুজল,
ভিজায়ে ও পদতল,
মিটাই মনের সাধ, প্রাণের কামনা!

১০

বল তবে প্রিয়তম,
কে সুভগা মম সম,
কার তুমি মতি গতি ধ্যান ও ধারণা?—
এত সুখে ভ'রে হৃদি,
কারে দিয়াছেন বিধি,
কে,ও'রাজ্য একেশ্বরী—অনন্যপ্রধানা?

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলিরচয়িত্রী।

স্বর্গ।

১

স্বরগ স্বরগ নাম শুনি সর্ব্বক্ষণ।
কোথায় স্বরগ ধাম, স্বরগ কাহার নাম,
ভেবেছি করিব আমি তাহার বর্ণন॥

২

পুণ্যাত্মা জনের পুণ্যময় হৃদিতল
বহে যথা নিরমল ধর্ম্মনীর সুশীতল,
প্লাবিত করিয়া ধরা, সেই স্বর্গ স্থল॥

৩

বহে যথা নিরন্তর ধর্ম্মের সুবাস
চির দিন যার গুণে, চিরসুখী সর্ব্বজনে,
শান্তিতে বিধৌত সদা যাহার আবাস।

৪

সেই স্বর্গ ধাম ভবে সেই স্বর্গ ধাম,
পাপ সঙ্গ পরিহরি চল মন ত্বরা করি,
পবিত্র স্বরগ রাজ্যে লভিতে বিশ্রাম।

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬০ সংখ্যা | পৌষ ১৩০১—জানুয়ারি ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজধানীর শুভযোগ—রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন সপরিবারে ও সদলে পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। ছোট লাটও সদলে আসিয়াছেন। ত্রিপুরা, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যের রাজারাও এখানে শুভাগমন করিয়া নগরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। জয়পুর, যোধপুর, কর্পূরতলা, পদুকোটা প্রভৃতির মহারাজগণেরও আগমনের সম্ভাবনা।

জাতীয় মহাসভা—বিলাত হইতে পার্লেমেণ্ট সভ্য মেঃ ওয়েব এম, পি এবং ভারতের নানাস্থানীয় প্রতিনিধিগণ মান্দ্রাজে উপনীত হইয়াছেন। ওয়েব সাহেব সভাপতির কার্য্য করিবেন, পথে বোম্বাইয়ে তাঁহার জাঁকাল অভ্যর্থনা হইয়াছে।

নারিকেলে মুক্তা—বিলাতের ডাক্তার মরিস বলেন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের নারিকেলের জলে বহুমূল্য মুক্তা জন্মে। ঝিনুকের ন্যায় নারিকেলও কি স্বাতীনক্ষত্রের জল পান করে?

ক্ষুদ্রতম পক্ষী—বামাবোধিনীতে হমিং বা গুণ গুণ পক্ষীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, ইহা পক্ষিজাতির মধ্যে ক্ষুদ্রতম। এক একটী ওজনে ৵০ আনাও হইয়া থাকে।

মহৎলোকের মৃত্যু—সুয়েজখালের প্রসিদ্ধ খননকর্ত্তা কাউণ্ট ডিলেসেপ্‌স ৮৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। শেষ অবস্থায় তাঁহার বড় দুঃখ দুর্গতি গিয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

ইটালীর ভূমিকম্প—এই ভূমি-

...কম্পে শত শত লোকের মৃত্যু, অনেক অট্টালিকা ভগ্ন এবং অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। একটী গির্জায় উপাসনা হইতেছিল, গৃহটী পড়িয়া গিয়া অধিকাংশ লোক হত হয়।

চিন জাপানী যুদ্ধ—জাপানীরা পোর্ট আর্থর জয়ের পর টাকুবক্জো এবং হে চেং অধিকার করিয়াছে। চিনেরা ক্রমাগত হারিতেছে ও হটিতেছে। চিনদূত সন্ধিপ্রস্তাব লইয়া জাপান সম্রাটের নিকট গিয়াছেন।

ভারত. চিকিৎসা সভা—গ ২৪ এ ডিসেম্বর সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ গৃহে ইণ্ডিয়ান মেডিকাল কনগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, নানা দেশ বিদেশ হইতে প্রতিনিধি ডাক্তার সকল উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন।

আলেকজণ্ডার এবং আফ্রিকার কোন প্রদেশীয় অধিপতি।

আজ কাল সভ্যতার জন্য অনেকেই পাগল, কিন্তু চৈতন্য, বুদ্ধ, রামপ্রসাদ প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মের পাগল আর দেখা যায় না। ধর্ম্ম সভ্যতার ভানমাথান, কপট গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, গণিয়া গণিয়া কথা বলার মধ্যে বড় একটা মিশিতে চাহেন না। ধর্ম্ম কেবল লেখনীনিঃসৃত বা মুখনিঃসৃত "দয়া" "প্রেমের" নিকটও তিষ্টিতে পারেন না। তিনি রাজনীতির, সমরনীতির, অর্থনীতির ও সমাজনীতি প্রভৃতির কূট-তর্কেরও বাধ্য নহেন। ধর্ম্ম নিজে সরল, চাহেন সারল্য, ইহার প্রমাণস্বরূপ আজ আমরা একটী সভ্য দিগ্বিজয়ী অধিপতি ও একটী অসভ্য রণানভিজ্ঞ শান্তিপ্রিয় নৃপতির বিষয় পাঠিকা ভগিনীগণকে উপহার দিতেছি।

যে সময় মহাবীর আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি একদিন জয়োল্লাসে তাঁহার বিজয়ী সৈন্যগণের সহিত আফ্রিকার কোনও অসভ্য দেশের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানবাসী লোকেরা অতিশয় শান্তিপ্রিয় এবং পত্রকুটিরে বাস করিত। ইহারা কখনও যুদ্ধ বা জেতা বিজেতা কাহাকে বলে তাহা জানিত না। আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে উপস্থিত হইলে এই দেশবাসীরা তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক রাজার নিকট লইয়া গেল। আফ্রিকা অধিপতি নূতন অতিথিকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও তাঁহাকে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইলেন; এদিকে অতিথি সৎকারের জন্য খাদ্যাদিরও আয়োজন চলিতে লাগিল। যথাসময়ে আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে প্রচুর খাদ্যবস্তু রক্ষিত হইল, ঐ খাদ্য

আর কিছুই নহে, সোণার রুটী, ফল ও মাংস ইত্যাদি। ঐরূপ অদ্ভুত খাদ্য-দর্শনে আলেকজাণ্ডার সবিস্ময়ে বলিলেন "আপনার দেশে কি স্বর্ণ ভক্ষিত হইয়া থাকে?"

আফ্রিকার বর্ব্বররাজ বলিলেন, "আমি তাহাই বিবেচনা করি, কারণ যখন আপনাদের দেশে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য আছে, তখন আপনি কি জন্য এই সুদূর প্রদেশে আগমন করিয়াছেন?"

আ। আপনার এই স্বর্ণরাশির লোভে আমি এখানে আসি নাই, আপনাদের রীতিনীতি জানিবার নিমিত্ত এই সুদূর প্রদেশে আসিয়াছি।

সুচতুর আলেকজাণ্ডারের বাক্য শ্রবণ করিয়া অধিপতি বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হউক, আপনার যতদিন ইচ্ছা আমাদের মধ্যে বাস করুন্।"

ইহাঁদের এই সমস্ত কথোপকথন সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরে দুইটী নগরবাসী বিচারপ্রার্থী হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বাদী বলিলেন, "আমি প্রতিবাদীর নিকট হইতে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছি। ঐ জমীতে আমি নালা খনন করিতে গিয়া অনেক অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ অর্থ রাশি আমার নয়, আমি কেবল জমী খরিদ করিয়াছি মাত্র, উহাতে যে গুপ্ত অর্থ ছিল তাহাত আমি খরিদ করি নাই। তথাপি ঐ জমীর পূর্ব্বাধিকারী যিনি প্রতিবাদী, তাঁহাকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করাতেও তিনি ঐ অর্থ গ্রহণ করিতেছেন না।"

প্রতিবাদী বলিলেন, "আমি ভরসা করি আমার দেশীয় ভ্রাতৃগণের ন্যায় আমারও বুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞান আছে, আমি বাদীর নিকট জমীর সমুদয় স্বত্ব বিক্রয় করিয়াছি, সুতরাং ঐ অর্থ এখন বাদীর।"

এই দেশের অধিপতিই প্রধান বিচারক। তিনি এই সকল কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলেন। যাহাতে তাঁহার বিচারে বিন্দুমাত্র দোষস্পর্শ না হয়, তিনি সেজন্য বিশেষ চিন্তা করিয়া তৎপরে প্রতিবাদীকে বলিলেন, "ভরসা করি আপনারও পুত্র সন্তান আছে।"

প্র। আজ্ঞা হাঁ।

বিচারক তৎপরে বাদীকে বলিলেন, "আপনার কন্যা সন্তান আছে?"

বা। আজ্ঞা, হাঁ।

অধিপতি বলিলেন "তাহা হইলে প্রতিবাদীর পুত্রের সহিত বাদীর কন্যার বিবাহ দেওয়া হউক এবং সেই নব-দম্পতীকে ঐ অর্থ যৌতুকস্বরূপ প্রদান করা হউক।"

এই ঘটনায় আলেকজাণ্ডারকে আশ্চর্য্যান্বিত এবং বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় দর্শন করিয়া অধিপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বিচার কি অন্যায় হইয়াছে?"

আ। না মহাশয়! আপনার বিচারে আমি চমৎকৃত হইয়াছি।

অ। যদি আপনার দেশে এইরূপ ঘটনা ঘটিত, তাহা হইলে কিরূপ বিচার করিতেন?

আ। সত্য বলিতে কি, আমরা বাদী প্রতিবাদী উভয়কে আবদ্ধ রাখিয়া ঐ অর্থ রাজ-ভাণ্ডারে রক্ষা করিতাম এবং ঐ অর্থ রাজারই ব্যবহার্য্য হইত।

আলেকজাণ্ডারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অধিপতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কি. রাজার ব্যবহার্য্য! সূর্য্য কি সেই দেশে কিরণ প্রদান করিয়া থাকেন?

আ। হাঁ।

অ। সে দেশে বৃষ্টি হয়?

আ। নিশ্চয়ই।

অ। খুব আশ্চর্য্যের বিষয়। আচ্ছা, সে দেশে গৃহ পালিত পশু আছে, যাহারা তৃণ ঘাস দ্বারা জীবন ধারণ করে?

আ। বহুসংখ্যক এবং নানাবিধ।

অ। কারণ বুঝিয়াছি, জগদীশ্বর ঐ সকল নিরীহ পশুগণের খাতিরে সূর্য্যকে কিরণ এবং মেঘকে জলবর্ষণ করিতে দিতেছেন।

পাঠিকা ভগিনীগণ! আলেকজাণ্ডারের সভ্যতা ভাল, কি অসভ্য আফ্রিকা অধিপতির সরল ধর্ম্মবিশ্বাস ভাল এবং উক্ত দেশ স্বর্গ কি মর্ত্ত্য এবং উক্ত দেশবাসিগণ দেবতা কি মানব? আপনারা তাহার মীমাংসা করুন, আমি অদ্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। কু. রা।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনায় সন্তানের মুক্তি।

(৩৫৭ সংখ্যা ২৩৯ পৃষ্ঠার পর)

এইরূপে মাতৃ-ভক্ত মাতৃ-উপাসক সন্তানের ভক্তি-বৃত্তি যখন পূর্ণ বিকাস পাইতে থাকে, তখনই ভক্তির তৃতীয় বা চরম অবস্থা উপস্থিত হয়। হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে "যদ্দারা পরমাত্মার সহিত মনের একতা সাধিত হয়, তাহাই ভক্তিযোগ।" আমরা ইহাকেই ভক্তির তৃতীয় অবস্থা বলিতেছি। মাতৃভক্ত সন্তানের পক্ষে মাতৃত্বের সহিত মনের একতা সাধনেই ভক্তির সম্পূর্ণতা। মাতৃত্বের সহিত মনের ঐক্য করিতে হইলে মাতৃত্বের আদর্শে সন্তানের আত্ম-গঠন করিতে হয়; মাতার সদ্গুণ সকল গ্রহণ করিতে হয়। এই ভক্তিভাবে মাতৃত্ব-সাধনা অর্থাৎ মাতার সদ্গুণের মহত্ব বুঝিয়া তাহা অভ্যাস করাই শেষ মাতৃ-উপাসনা। ইহাতেই সন্তান মাতার দেবভাব স্পষ্ট দেখিতে পান। ইহাই ভক্তির শেষ সীমা, উপাসনার শেষ সীমা— মাতৃভক্তিরও শেষ সীমা! উপাস্য দেবতার মত সম্পূর্ণ হও, এই শিক্ষাই শিক্ষা! আর্য্য ঋষিগণ বেদ উপনিষদে, গীতা ভাগবতে, এই শিক্ষাই দিয়াছেন। নরদেবতা যীশুখ্রীষ্ট এই

শিক্ষাই দিয়াছেন। চৈতন্য, নিত্যানন্দ, নরদেবতারাও এই শিক্ষাই দিয়াছেন। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় এই শিক্ষাই দিতেছেন; নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখোজ্জ্বলকারী মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "কৃষ্ণ-চরিত্র" গ্রন্থে এই শিক্ষাই দিয়াছেন। মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতেও সন্তানকে এই শিক্ষায় প্রবর্ত্তিত করে। মাতৃ-ভক্তির উচ্ছ্বাসে সন্তান যদি ব্রহ্মভাবে তন্ময় হইয়া মাতৃ-উপাসনায় মাতৃত্বের আদর্শে আপনাকে সম্পূর্ণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই সন্তানের দেবত্ব লাভ হয়, সন্তানত্ব সার্থক হয়, মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতে সন্তানের মুক্তি লাভ হয়।

এইখানে একটী কথা আছে, কথা এই যে এ জগতে সাধারণ মনুষ্যজীবন অসম্পূর্ণ; শিক্ষা ও সাহায্য অভাবে সাধারণ বঙ্গমহিলার জীবন আরও অসম্পূর্ণ; অথচ এ দেশে বঙ্গমহিলারাই সন্তানের মাতা। জগতে দেবচরিত্রই মানব শিক্ষার পূর্ণ আদর্শ, তদভাবে দেবতুল্য চরিত্রবান্ মানবই মনুষ্যত্বের আদর্শ। এরূপ স্থলে বঙ্গমহিলাদিগের সন্তানগণ মাতৃ-চরিত্র আদর্শে আত্মগঠন করিলে—মাতার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগের জীবনের সম্পূর্ণতা লাভ অসম্ভব। মাতা কোপনস্বভাবা হইতে পারেন, কলহপ্রিয়া হইতে পারেন, কুসংস্কারপরায়ণা হইতে পারেন—বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার যে রকম দুরবস্থা, তাহাতে এদেশীয় মাতাদিগের চরিত্রে এ প্রকার বহুল ত্রুটি লক্ষিত হইতে পারে, তবে তাঁহাদের জ্ঞানী, কৃতবিদ্য সন্তানগণও কি মাতৃ-ভক্তি সম্পূর্ণ করিতে গিয়া এই দারুণ অবনতিগ্রস্ত হইবেন? মুক্তি লাভের পরিবর্ত্তে কি মুক্তি পথে কাঁটা পড়িবে? কোনও মাতৃ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এরূপ প্রশ্ন অবশ্যই করিবেন না। কিন্তু সাধারণের মনে এ প্রশ্নের উদয় হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার উত্তর এই যে মাতৃভাবের জন্যই মাতা বিশ্বমাতার প্রতিকৃতি। বঙ্গমহিলাদিগের জীবন অন্যান্য অংশে অসম্পূর্ণ হইলেও মাতৃত্বে সম্পূর্ণ। মাতা শিক্ষিতা হউন আর অশিক্ষিতা হউন, বিশ্ব সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ দেবভাবে মাতৃ-হৃদয় পূর্ণ করেন। বিশ্বজগতে ভগবানের দেবত্ব যেমন প্রকাশিত, সন্তানের পক্ষে মাতার দেবত্বও তেমনি প্রকাশিত; তাই মা সন্তানের দেবতা—মা সংসারের চক্ষে অশিক্ষিতা হউন, অশ্রদ্ধেয়া হউন, নগণ্যা হউন, তিনি সন্তানের সর্ব্বার্থসাধিকা পরম দেবতা। মাতৃত্বের আদর্শে সন্তান যখন আত্মগঠন করিতে পারেন, তখন সন্তানও দেবতা হইতে পারিবেন। মাতৃত্ব ও যা, দেবত্ব ও তাই। এই মাতৃত্বে ও দেবত্বে কিরূপ ঐক্য তাহা আমরা তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

মাতৃত্বের প্রথম লক্ষণ—ভালবাসা। ভালবাসা গুরুজনের প্রতি সমর্পিত হইলে ভক্তি, বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিদিগের উপরে সমর্পিত হইলে প্রণয় এবং কনিষ্ঠ সম্পর্কীয় ব্যক্তির উপরে সমর্পিত হইলে স্নেহ

সুতরাং স্নেহ ভালবাসারই রূপান্তর মাত্র। ভালবাসা যে দেব-বৃত্তি, একথা অনেকেই জানেন, আমরাও উপস্থিত প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। ভালবাসা প্রেমময় জগদীশ্বরের প্রকৃতির অংশ। ভগবতী বিশ্বজননীই ভালবাসার পূর্ণ আদর্শ। এ বিশ্বজগৎ কিসের বলে টিঁকিয়া আছে? এই সকল গ্রহ উপগ্রহ, এই সকল বৃহত্তম পদার্থ হইতে জড়াণু, জীবাণু, পরমাণু পর্য্যন্ত কিসের বলে সুনিয়মে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে? কিসের বলে জগতের অসংখ্য অভাব প্রতিক্ষণেই পূর্ণ হইতেছে? আর তুমি মর মানব! তোমার শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী, এই চতুর্বিধ বৃত্তির পোষক ও রক্ষক উপকরণসমূহ কোথা হইতে পাইতেছ? তুমি ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিবে বলিয়া উপযুক্ত আহার পানীয়, তুমি জ্ঞানী হইবে বলিয়া তোমার জ্ঞান-প্রবর্দ্ধক উপকরণ নিচয়, তুমি সাধুতা ও মহত্ব লাভ করিবে বলিয়া তদুপযোগী সাধু, মহৎ প্রবৃত্তি ও সদিচ্ছা সকল, তুমি প্রীত হইবে বলিয়া সুন্দর কুসুমরাজি, সুশ্রাব্য বিহঙ্গগীতি, সুদৃশ্য মেঘশ্রেণী, প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যছটা, এ সব কেমন করিয়া আসিল? ইহাতেও কি আমরা বুঝিব না যে এ সবই সেই স্নেহময়ী বিশ্বজননীর অপরিমিত স্নেহের দান! বিশ্বতত্ত্ব যতই আলোচনা করিবে, ততই বুঝিতে পারিবে, বিশ্বজগতের কোনও কার্য্য কেবল কর্ত্তব্যপালনের অনুরোধে সম্পন্ন হয় নাই, সকল বিষয়ই বিশ্বজননীর ভালবাসার পূর্ণ আদর্শ। আর এ জগতে স্নেহের—অপরিসীম স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়! তাই বলিতেছি ভগবতী বিশ্বজননীর মাতৃ-স্নেহই আদর্শ ভালবাসা! ভগবতী বিশ্বজননী স্বর্গীয় ভালবাসায় মাতৃহৃদয় পূর্ণ করেন, তাই মাতৃস্নেহ সীমাশূন্য! তাই সন্তানের ভালবাসায় মা' পাগলিনী! তাই সন্তান মা'র প্রাণের সর্ব্বস্ব; মা সন্তানের মঙ্গল আশয়ে অনায়াসে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন, সকল সুখের মাথায় পদাঘাত করিতে পারেন! মাতৃস্নেহ ভাষায় লিখিবার জিনিস নহে, বক্তৃতায় বুঝাইবার জিনিস নহে; তাহা কেবল প্রকৃত মাতৃভক্ত সন্তান প্রাণের প্রাণে অনুভব করিতে পারেন! এই ভালবাসায় অভ্যস্ত হইতে পারিলেই মানব দেবতা হইতে পারেন। যাঁহারা "নরদেবতা" আখ্যা পান, তাঁহাদের হৃদয় মাতৃস্নেহের মত আদর্শ ভালবাসায় পরিপূর্ণ। খৃষ্ট, চৈতন্য, শাক্যসিংহ হাউয়ার্ড, জেনারল বুথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

মাতৃত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ সমতা—মাতৃ-স্নেহে যে বৈষম্য নাই, একথা সকলেই জানেন। মাতা বহু সন্তানবতী হইলেও, প্রত্যেক সন্তান মাতৃস্নেহ সমভাবে পাইয়া থাকেন। এ উদারতাও ভগবৎ-সম্পত্তি। এ জগতে কি বৃহত্তম কি ক্ষুদ্রতম, সকল পদার্থই ভগবানের।

"ছোট বড়" বিচার না করিয়া তিনি সকলকেই সমভাবে স্নেহ করিতেছেন, সমভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, সমভাবে সকলের অভাব পূর্ণ করিতেছেন! এই অনন্ত শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই মাতা সমভাবে সকল সন্তানকে স্নেহ করেন, সমভাবে পরিচর্য্যা করেন, সমভাবে মঙ্গলকামনা করেন! তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ভগবদ্ভক্ত সাধু যেমন ভগবানের প্রিয়, মাতৃভক্ত সুশীল সন্তানটিও সেইরূপ মাতার অধিকতর প্রিয়; কিন্তু তাহা হইলেও ভগবানের মমতার ন্যায় মাতার মমতাও সকল সন্তানের প্রতি সমভাবাপন্ন। এই মমতার আদর্শে নরদেবতাগণ সমতা শিক্ষা করেন; ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পুরুষ, রমণী, ধনী, দরিদ্র সকলকে সমভাবে প্রীতি দান করিয়া থাকেন।

মাতৃত্বের তৃতীয় লক্ষণ সহানুভূতি ও দয়া—সন্তানের শরীর যেমন মাতৃরক্তে গঠিত, সন্তানের হৃদয়ও সেইরূপ মাতৃকর্ত্তৃক বিকসিত হয়। তাই প্রাপ্তবয়সেও সন্তানের হৃদয়-তত্ত্ব মা' বুঝিতে পারেন। অন্যের নিকট মানবচরিত্রের যে সকল রহস্য অবোধ্য, মাতা তাহাও বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন। কোনও ভাবোচ্ছ্বাসে সন্তান কোনও কার্য্য করিয়াছে, অন্তর্যামিনী দেবতার মত মাতাই সে সকল জানিতে পারেন। তাই সন্তান সহস্র দোষী হইলেও মা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত সহানুভূতি আছে, যিনি দোষীর অবস্থা, উপযোগিতা, দোষের অবশ্যম্ভাবী কারণ বুঝিতে পারেন, এজগতে দোষীকে তিনিই প্রকৃত দয়া করিতে পারেন। মাতৃহৃদয় এইরূপ সহানুভূতিপূর্ণ। "আমার বাছা রাগের মাথায় কুকথা বলেছে" অথবা "আমার বাছা মোটে খিদে সইতে পারে না, আজ খিদের জ্বালাতেই কুপথ্য করেছে" এ রকম কথা যে কতদূর সহানুভূতিপূর্ণ, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণ অবশ্যই বুঝিবেন। এরকম কথা যাঁহার মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়, সেই মাতৃহৃদয় যে কিরূপ সহানুভূতিপূর্ণ, তাহা ভাবিতেও পারা যায় না! জগতের মানব প্রকৃত সহানুভূতি দুই জনের কাছেই পাইয়া থাকেন; একজন, যিনি মানব-হৃদয় গঠন করেন, সেই জগজ্জননী; আর একজন যিনি সেই হৃদয় একটু একটু করিয়া ফুটাইয়া তোলেন, সেই গর্ভধারিণী। এই সহানুভূতির জন্যই মা সন্তানের সুখে সকল লোকের অপেক্ষা সুখী হন, সন্তানের দুঃখে সকল লোকের অপেক্ষা দুঃখিতা হন! মা আমাদের সুখ দুঃখ যতদূর গ্রহণ করিতে পারেন, অনেক সময়ে আমরা নিজেরাও ততদূর পারি না। এই সহানুভূতি হইতেই দয়ার উৎপত্তি। যিনি দুঃখীর দুঃখ অনুভব করিতে পারেন, দয়া তাঁহার হইবেই। মা' সন্তানের দুঃখ সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারেন বলিয়াই সন্তানের মধ্যে দুঃখী সন্তানটী তাঁহার সর্ব্বস্ব

ধন হইয়া থাকে। তাই ভগবান্ যেমন দীনহীনের গতি, দয়াময়ী মা'ও সেই রকম দীনহীনের গতি; মর জগতে যাঁহাদের এই সহানুভূতি ও দয়া আছে, তাঁহারাও দীন হীনের গতি; তাঁহারা নরদেবতা।

মাতৃত্বের চতুর্থ লক্ষণ ক্ষমা—সাধারণ মানব ক্ষমাকে দুর্ব্বলতা মনে করিতে পারেন, কিন্তু জ্ঞানিগণ বোঝেন যে ক্ষমাই প্রকৃত বীরত্ব। "যে মারিবে তাহাকে মারিব, যে গালি দিবে তাহাকে গালি দিব, যে রাগ করিবে তাহার উপর রাগ করিব" ইহাই সাধারণ মানব-ব্যবহার। মা'র খাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে, গালির উত্তরে মিষ্টকথা বলিতে, শত্রুর সহিত সাধু ব্যবহার করিতে, এজগতে কয়জনের ক্ষমতা আছে? তাই বলিতেছি, ধন মান, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি উপার্জ্জন করা সহজ, প্রকৃত ক্ষমাশীল হওয়াই কঠিন। সাধারণ মানবচরিত্র অসম্পূর্ণ; তাই সাধারণ মানব চরিত্রে ভ্রম, ত্রুটি ও দোষ বহুল পরিমাণে দেখা যাইতে পা[illegible] কিন্তু অনেক মানবের স্বভাব এই যে নিজেদের [illegible] দোষ থাকিলেও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না, অথচ পর-চরিত্রে সামান্য ত্রুটি দেখিলেই ক্রোধান্ধ হইয়া পড়েন! দোষীকে ক্ষমা করা দূরে থাকুক, পদ-দলিত করাই যেন তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য! কিন্তু দেবভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভগবানের চরণে মানব মাত্রেই অপরাধী। অজ্ঞান, দুর্ব্বলচেতা মানবদিগের তো কথাই নাই, জ্ঞানী, মহাত্মারাও কত সময়ে ভ্রম প্রমাদাদির জন্য পাপচিন্তা, পাপকামনা প্রভৃতির বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষমাময় জগদীশ্বর চিরদিনই মানবের সকল অপরাধ ক্ষমা করিতেছেন, চিরদিনই মানবকে কুপথ হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন; নরাধম বলিয়া তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন না! এই ক্ষমা আর আছে মাতৃ-হৃদয়ে! মানবকুলে এমন ভাগ্যবান্ বা ভাগ্যবতী কে আছেন যে মাতৃচরণে কোনও অপরাধ করেন নাই? কেবল কুসন্তান নহে, সুসন্তানগণও মাতৃচরণে বহুতর অপরাধ করিয়া থাকেন। সময়ে মানব ইতালীর ম্যাট্সিনি বা বাঙ্গালার বিদ্যাসাগরের ন্যায় ভক্তিমান্ সন্তান হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহারও শৈশব কৈশোরে দুরন্তপনা ছিল, আবদার ছিল, স্বেচ্ছাচারিতা ছিল! প্রাপ্ত বয়সেও ভ্রম ও অসাবধানতায় তাঁহার সহস্র ত্রুটি হইতে পারে! কিন্তু সন্তান সহস্র অপরাধী হউন, চোর হউন, ডাকাত হউন, আত্মীয় বন্ধুর ঘৃণ্য হউন, সমাজের পরিত্যক্ত হউন, তথাপি মা তাহাকে "সন্তান" বলিয়া গ্রহণ করিবেন! ভগবানের মত মাও অনুতপ্ত সন্তানকে ক্ষমা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

মাতৃত্বের পঞ্চম ও ষষ্ঠ লক্ষণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা—সন্তান গর্ভস্থ হইতে সন্তানের জীবিত কাল পর্য্যন্ত মাতার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অক্ষুণ্ণাবস্থায় থাকে।

জগতের মানব সহস্র দুর্দ্দান্ত হইলেও ভগবতী বিশ্বজননী তাহা ধীরভাবে সহিয়া থাকেন। আর গর্ভজাত সন্তান সহস্র অত্যাচারী হইলেও জননী দেবী ধীরভাবে সহিয়া থাকেন। তা ছাড়া সন্তানের লালনপালন করিতে সন্তানের পরিচর্য্যার জন্য নিজের গায়ের রক্ত জল করিতে মা' অধীর হইয়াছেন বা কবে? অসহিষ্ণু হইয়াছেন বা কবে? ব্রহ্মাণ্ডপালনে ব্রহ্মাণ্ড জননীর যেমন ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, সন্তানপালনে সন্তান-জননীরও সেই রকম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। যে মহাত্মা এইরূপ ধৈর্য্যশীল ও সহিষ্ণু হইতে পারেন, তিনিই জগতে গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম।

মাতৃত্বের সপ্তম ও অষ্টম লক্ষণ আত্ম-ত্যাগ ও সেবাপরায়ণতা—আত্মত্যাগ ও সেবাপরায়ণতা, এ দুইটীতে বড় নিকট সম্বন্ধ,একটী অপরটীর সাপেক্ষ। এসংসারে যিনি আত্মত্যাগ করিতে পারেন, সেবা-পরায়ণ হইতে তাঁহারই ক্ষমতা আছে; অথবা যিনি সেবা-পরায়ণ হইতে পারেন, আত্মত্যাগে তাঁহারই ক্ষমতা আছে। আত্মত্যাগ ও সেবার পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর, তিনি বিশ্বজগতের জন্য যেরূপ আত্ম-ত্যাগী, যেরূপ সেবাপরায়ণ, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়! এই ভগবৎশক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই মাতা সন্তানের জন্য আদর্শ আত্মত্যাগিনী—আদর্শ সেবাপরা-য়ণা। মা সন্তানের জন্য কি প্রকার আত্মত্যাগ করেন, কি প্রকার সেবায় আত্মসমর্পণ করেন, তাহা আমরা ইতি-পূর্ব্বে বলিয়াছি। আত্মত্যাগপূর্ণ সেবার উচ্চ গৌরব এই যে ইহাতে দীনতা ও সহৃদয়তা ভিন্ন অহঙ্কারের লেশ মাত্র থাকে না। মা' কখনও ভাবেন না "আমি মহৎ, তাই শিশু অথবা সন্তানের পরিচর্য্যা করিতেছি।" অথবা "আমার জন্যই সন্তান এত উপকৃত হইতেছে!" মা সন্তানের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিয়াই সেবাপরায়ণা হন, তাই সকল সুখ হইতে বঞ্চিতা হইলেও মাতার প্রাণ আকুল হয় না এবং সন্তান-সেবায় প্রাণ গেলেও আত্মগৌরব ভাবিতে পারেন না। পাছে তাঁহার সেবার অযোগ্যতায় সন্তানের ক্লেশ হয়!—এই দীনতা! আর "বাছা আমার কিসে সুখে থাকিবে?" এই প্রাণের টান সহৃদয়তা। যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র কন্যা, তাঁহাদের মধ্যে এই আত্মত্যাগ ও সেবাপরায়ণতা প্রবল হইয়া থাকে। বুথের মুক্তিফৌজ সম্প্রদায় ও কলিকাতার দাসাশ্রমও ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মাতৃত্বের নবম লক্ষণ নিঃস্বার্থ হিতৈ-ষণা—জগদীশ্বরের কার্য্য যেমন জগতের হিতের জন্য, নিজের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধি অভিপ্রায়ে নহে, মাতার সকল কার্য্যও সেইরূপ সন্তানের মঙ্গল আশয়ে, নিজের কোন প্রয়োজন সিদ্ধি অভিপ্রায়ে নহে। সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হইলেই মা পরিতৃপ্তা ও চরিতার্থা হন। মাতৃস্নেহ সন্তানের ধন, মান, বিদ্যা, খ্যাতি, রূপ, স্বাস্থ্য প্রভৃতির অপেক্ষা রাখে না; বরং

ধনী অপেক্ষা দরিদ্র, বিদ্বান অপেক্ষা মূর্খ, সুন্দর অপেক্ষা কুৎসিত প্রভৃতি দুরবস্থা-গ্রস্ত সন্তানের উপরে মাতার আদর ও যত্ন যে অপেক্ষাকৃত অধিক, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এরূপ ভাব যে নিঃস্বার্থতার আদর্শ, সেকথা বলা বাহুল্য মাত্র। এইরূপ নিঃস্বার্থ হিতৈষণা শিক্ষা করিলে মানব "দেবতা" হইয়া উঠেন।

মাতৃত্বের দশম লক্ষণ পবিত্রতা—যিনি সকল প্রকার পাপ মলিনতার অতীত, যিনি নিষ্কলঙ্ক, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, তিনিই প্রকৃত পবিত্র। সন্তানের কাছে মাতৃ-দেবী এইরূপ পবিত্রা, পবিত্রতমা। যেমন পবিত্রতম ঈশ্বরের পবিত্র কিরণে মানবের অসৎবৃত্তি ও পাপ সকল পুড়িয়া ভস্ম হয়, পবিত্রতারূপিণী মাতৃদেবীর পবিত্র কিরণে সন্তানের অসংবৃত্তি ও পাপ সকল সেই রকম পুড়িয়া ভস্ম হয়। সন্তান মা'র কাছে দাঁড়াইলে—বৃদ্ধ হউক, যুবক হউক—সে শিশু। সে শিশুর মত সরলতা, শিশুর মত কোমলতা, শিশুর মত পবিত্রতা পাইবার যোগ্য হয়। "মা" বলিলেই সন্তানের হৃদয় ক্ষণকালের জন্যও নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হইয়া থাকে। এইজন্য মাতৃ-সম্বোধন আমাদের দেশে পবিত্রতা ও বিশ্বস্ততার প্রতিজ্ঞাস্বরূপ। যে কোনও পুরুষ "মা" বলিয়া ডাকে, অবরোধবাসিনী বঙ্গ-মহিলা তাহাকে গর্ভজাত পুত্রবৎ নির্ম্মল-চরিত্র, বিশ্বাসভাজন ও পবিত্রহৃদয় মনে করেন। "মা" বলিলেই মা'র মহত্ত্ব, মা'র দেবত্ব, মা'র পবিত্রতা সন্তানের মনশ্চক্ষে আবির্ভূত হইবে, পরের মা'কে "মা" বলিলেও সে ভাব জাগরুক রহিবে। পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বর ও পবিত্রতারূপিণী মাতা, ইহাতে সন্তানের চক্ষে কোনও পার্থক্য নাই—যাহার থাকে সে "সন্তান" নামের অযোগ্য। এই পবিত্রতাতেই মা'র পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পবিত্রতা মানব জগতেরও শ্রেষ্ঠতম অলঙ্কার।

এই সকল দেবভাবে মাতৃ-হৃদয় পূর্ণ। দেবত্বে যাহা আছে, মাতৃত্বেও তাহাই আছে। মাতৃ-ভক্তগণ ভক্তিভাবে তন্ময় হইয়া যখন মাতার ব্রহ্মভাব বুঝিতে পারেন, যখন মাতৃ-হৃদয়ের আদর্শে আত্ম-গঠন করিতে পারেন, তখনই সন্তান দেবত্ব লাভ করিতে পারেন। জগতের চক্ষে তিনি মহৎ হউন বা ক্ষুদ্র হউন, তাঁহারই জীবন ধন্য হয়, মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতে সন্তানের মুক্তি সাধিত হয়।

(ক্রমশঃ)

বিগত শত বর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা।

(৩৫৯ সংখ্যা ২৩০ পৃষ্ঠার পর)

ব্যক্তিগত অবস্থা ধর্ম্মভাব; গত শতাব্দীর প্রথম যুগ প্রবর্ত্তন সময়ে(১২০১ সালে) এদেশে ধর্ম্মভাব অর্থাৎ ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস বড়ই প্রবল ছিল। তখন

ধর্ম্মশিক্ষার প্রধানতঃ দুইটি পথ ছিল, এক পুরাণ শ্রবণ অপর ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান। তখন ঘরে ঘরে ঠাকুর ঘর ও গ্রামে গ্রামে দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা হইত। পুরুষেরাও অতি অল্প বয়সে ইষ্ট গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিকাদি ধর্ম্ম ক্রিয়ায় রত হইতেন। এসময়ে, পিতা, ভ্রাতা, স্বামী প্রভৃতির উপদেশে, মাতা পিতামহী শ্বশ্রূ প্রভৃতির আদর্শে ভারতবাসিনীরাও অতি অল্প বয়স হইতে ঈশ্বরে ভক্তিমতী হইতেন। ভক্তি বিশ্বাস অনুশীলন-ফলে প্রাপ্ত বয়সে তাঁহাদের ধর্ম্মভাব এত প্রবল হইত যে তাঁহারা শতাধিক ক্রোশ দূরবর্ত্তী তীর্থ স্থানে হাঁটিয়া যাইতেন; পীড়িত সন্তানাদির আরোগ্য কামনায় সপ্তাহাধিক কাল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া হত্যা দিয়া থাকিতেন; কোনও কোনও ব্রতে ব্রতী হইতে গিয়া ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতিতে অলৌকিক সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেন!—দেবতার প্রীতি কামনায় স্নেহময়ী মাতা প্রাণের সন্তানকেও অকূল সাগরে ভাসাইতে পারিতেন (১)!, ধর্ম্ম লাভ আশয়ে নব বিধবা মৃত পতির জলন্ত চিতায় শরীর ঢালিয়া দিতেন! (২) ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণ মস্তক মুণ্ডন, চীর বা গৈরিক বস্ত্র পরিধান, হবিষ্যান্ন ভোজন, কম্বল বা কুশাসনে শয়ন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা পুণ্যার্জ্জন করিতেন (৩)। অধিক কি, ধর্ম্মের নামে তাঁহাদের জীবন এরূপ উৎসর্গীকৃত ছিল, যে ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা অসাধ্য—অসাধ্য না হউক, সকল রকম দুঃসাধ্য কার্য্যই করিতে পারিতেন! মানব-শিশু যত দিন মস্তিষ্কের পরিচালনা করিতে না শিখে, যত দিন তাহার বিচার শক্তি অস্ফুটাবস্থায় থাকে, যতদিন মস্তিষ্কের শক্তি বিকাশ না হওয়াতে কেবল হৃদয়ের ভাবই অসংযতরূপে প্রবল হয়, ততদিন তাহার হৃদয়ে যেমন অলৌকিক সরলতা ও অলৌকিক বিশ্বাস, গত শতাব্দীর প্রথম যুগের আরম্ভ সময়ে ভারতমহিলাদিগের হৃদয়ে সেইরূপ সরলতা ও সেই রূপ বিশ্বাস বর্ত্তমান ছিল; ক্রমশঃ এবিষয় অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। ফলতঃ ধর্ম্মপ্রাণতায় তাঁহারা যে অলৌকিক শক্তিমতী ছিলেন, তাহার কারণ সেইরূপ সরলতা ও বিশ্বাস।

---

(১) সে কালে যে রমণীর উপযুক্ত বয়সে সন্তান না জন্মিত, তিনি ভগবানের উদ্দেশে প্রতিশ্রুত হইতেন যে "সন্তান জন্মিলে প্রথম সন্তানটী গঙ্গাকে দিব," পরে সন্তান জন্মিলে প্রথম সন্তানটী সাগর সঙ্গম তীর্থে নিক্ষেপ করিতেন!! এ প্রথা আর্য্য বংশীয়েরা অনার্য্যজাতির নিকটেই শিখিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

(২) সহমৃতা বা অনুমৃতাদিগের মৃত্যুর উদ্দেশ্য যে "নিষ্কাম ধর্ম্ম" নহে, তাহা শাস্ত্র ও দেশাচার অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণও অবশ্য জানেন।

(৩) অদ্যাপি ভারতের স্থানে স্থানে এইরূপ আয়াসসাধ্য "ব্রহ্মচর্য্য" প্রচলিত আছে, ইহাও নিষ্কাম ধর্ম্মানুমোদিত নহে। ইহার উদ্দেশ্য স্বর্গলাভ বা জন্মান্তরে বিধবা না হওয়া।

জ্ঞান—তখনকার সময়ে সাধারণতঃ মস্তিষ্ক হইতে হৃদয়ের শক্তি অধিকতর অনুশীলিত হইত, এই অনুশীলনে স্ত্রীজাতির এক বিশেষ ক্ষতি এই হইত যে, স্বভাবতঃ রমণীগণের হৃদয়ের শক্তি, মানসিক শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর, তাহার উপরে কেবল হৃদয়ের শক্তির অনুশীলনে মস্তিষ্কের শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িত। জ্ঞানানুশীলন ব্যতিরেকে জ্ঞান লাভ করা মানবের পক্ষে—অন্ততঃ সাধারণ মানবের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। জ্ঞানানুশীলন অভাবেই প্রাচীনা মহিলাগণ সাধারণ বিষয়ে তর্ক, বিচার, মীমাংসা, পরিণামদর্শিতা প্রভৃতি কার্য্যে অক্ষম ছিলেন। এই জন্য ভূত, প্রেত, ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতি উপদেবতাগণ স্ত্রীজাতির উপরে বড়ই "উপদ্রব" করিত; এই জন্য রোজা, ফকির প্রভৃতি বেশধারিগণ স্ত্রীলোকের নিকট হইতেই অধিকতর উপার্জ্জন করিতে পারিত; এই জন্য স্বামিবশীকরণ মন্ত্র, মৃতবৎসার সন্তানরক্ষার মন্ত্র, বন্ধ্যার সন্তান জন্মিবার মন্ত্র—প্রভৃতি নানাবিধ মন্ত্র তন্ত্র স্ত্রীজাতির উপরে প্রয়োগ করিলেই অধিকতর সফল হইত। জ্ঞানানুশীলনে অভাবেই সাধারণ মহিলাগণের মন এইরূপ অজ্ঞানতায় পূর্ণ ছিল।

মানবের বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে যেমন চক্ষু, অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে সেই রূপ জ্ঞান। অন্ধের অন্যান্য সহস্র সুখের উপাদান থাকিলেও তাহার ন্যায় দুঃখী এজগতে আর নাই, কারণ জগতে যাহা কিছু প্রিয়দর্শন, সে তাহা কিছুই দেখিতে পায় না, এবং দর্শনশক্তির অভাবেই তাহাকে পরমুখাপেক্ষী, স্বাবলম্বনে অক্ষম হইয়া জীবন্মৃতরূপে থাকিতে হয়; জ্ঞানহীন মানবও জগতে এই রকম দুঃখী। জগতে যাহা সত্য, সে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না; হিতাহিত বিচার শক্তির অভাবে তাহাকে আত্মরক্ষাতেও অন্যান্য গুরুতর কার্য্যে অশক্ত হইয়া থাকিতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে,

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ, জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে *॥

ভারতীয় ধর্ম্মাচার্য্যগণ যে জ্ঞানের এতাদৃশ গৌরব করিয়াছেন, তাহার এক প্রধান কারণ, জ্ঞানের অভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না—যাহা কিছু মনুষ্যত্বের উপকরণ, জ্ঞানের অভাবে তাহার একটীও উপযুক্ত রূপে বিকাস লাভ করিতে পারে না।—জ্ঞানহীন ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাদের বিদ্যা অবিদ্যার ফল উৎপাদন করিয়া থাকে, নীতি ও দুর্নীতি হইয়া উঠে। যাঁহারা অসভ্য জাতির ইতিবৃত্তে মনোযোগ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, মনুষ্যের মত সকল জিনিস থাকিয়া যাহাদিগের জ্ঞানের অভাব থাকে, তাহারা কিছুরই উপযুক্ত রূপে ব্যবহার করিতে

* হে পার্থ! ফলের সহিত সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত; অতএব দ্রব্যময় দৈব যজ্ঞ হইতে জ্ঞান যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। গী। ৪র্থ অ—৩৩ শ্লোক।

পারে না—জ্ঞানের অভাবে সরলতায় নির্ব্বোধতা, ধর্ম্মভাবে কুসংস্কারান্ধতা, আর সকল বিষয়েই আতিশয্য দোষে দূষিত হইয়া থাকে। আমাদের দুর্ভাগ্য তাই সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, প্রাচীনা মহিলাদিগের জীবনও মার্জ্জিত জ্ঞানের অভাবে এই সকল দোষে দূষিত ছিল।

কিন্তু এইখানে বলা আবশ্যক, সাধারণ বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন না হওয়াতেই পুরাতন মহিলাদিগের মানসিক শক্তি এরূপ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। নচেৎ তাঁহারা যে প্রকৃত পক্ষে নির্ব্বোধ ছিলেন না, তাঁহাদের সহজ বুদ্ধি যে স্বভাবতঃ উপযুক্তরূপে বিকসিত হইত, এবিষয় তাঁহাদিগের গার্হস্থ্য জীবন আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। এ জগতে তাঁহাদিগের একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র গৃহ, আর এক মাত্র কার্য্য গৃহধর্ম্ম পালন। এই কার্য্য ক্ষেত্রে তাঁহারা যেরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেন, প্রকৃত নির্ব্বোধ মানবের পক্ষে তাহা অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন, তাঁহাদিগের ব্যবহৃত (সম্ভবতঃ কাহারও কাহারও রচিত) চুট্‌কী গল্প ও প্রবচন হইতে, তাঁহাদিগের ভাবগ্রাহিতা ও চতুরতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলিও বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য। কেহ কেহ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্নাও ছিলেন।

নীতি—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তখন মানসিক শক্তির অপেক্ষা হৃদয়ের শক্তি অধিকতর প্রবল ছিল। এই জন্য নীতির বা চরিত্রের যে সকল সদ্‌গুণ হৃদয়শক্তির অন্তর্গত, প্রাচীনাদিগের সেই সকল সদ্‌গুণ যথোচিতরূপে পরিস্ফুট হইত; অর্থাৎ দয়া, সহিষ্ণুতা, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি সাধুভাবসকল এবং সেবা, পরোপকার, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি সাধুকার্য্য সকল, প্রায় সকল রমণীর হৃদয় ও শরীরের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল। এইজন্য নারীজীবন কোমলতার প্রতিকৃতি বলিয়া অনুভূত হইত। পক্ষান্তরে, নীতির যে সকল সদ্‌গুণ মানসিক শক্তির অন্তর্গত—ধীরতা, অপক্ষপাতিতা, আত্মসংযমন, প্রভৃতি, তাঁহাদিগের অনেকটা হীনতর ছিল *। এই জন্য তাঁহাদিগের অনেকে কোমলতার প্রতিকৃতি হইয়াও স্থিরবুদ্ধিহীনা, কোপনস্বভাবা, কলহপ্রিয়া বলিয়া অপবাদগ্রস্তা। শ্রমশীলতা ও গৃহকার্য্যানুরাগ যদি নীতির অন্তর্ভুত হয়, তবে তাহাতে তাঁহারা উচ্চতর প্রশংসা লাভের যোগ্য পাত্রী— অন্নপূর্ণা বা জগদ্ধাত্রী গৌরবে গৌরবান্বিতা হইবার উপযুক্তা।

বিদ্যা—সেকালে স্ত্রীজাতির মধ্যে লেখা পড়া শিখিবার প্রথা রহিত হইয়াগিয়াছিল, আমরা ইতিপূর্ব্বে সে কথার উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং গত শতাব্দীর

* এ সকল কথা সাধারণের প্রতি প্রযোজ্য। নচেৎ সেকালে যাঁহারা মহাপ্রাণা দেবী ছিলেন, তাঁহারা একথার লক্ষ্য নহেন। তাঁহারা উন্নতচরিত্রা।

প্রারম্ভসময়ে ভারত মহিলাগণ বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, সাহিত্য প্রভৃতির অমৃতাস্বাদ গ্রহণে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিতা ছিলেন। সংসারের দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব, বিদেশস্থ আত্মীয় বন্ধু-গণের লিখিত পত্রাদি পঠন বা তাঁহা-দিগকে পত্রাদি লিখন, শিশুদিগকে অধ্যাপনা প্রভৃতি কার্য্যও রমণী-হস্তে সম্পন্ন হইত না। এতদ্ভিন্ন লেখা পড়া শিখিলে মনের যে রূপ উন্নতি সাধিত হয় ও জগতের সুখ যেরূপ আয়ত্ত হয়, তাহা হইবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমরা তখনকার মহিলাগণের মানসিক শক্তি যে অনেক অংশে হীন দেখিতে পাই, তাহার এক প্রধান কারণ এই লেখা পড়ায় অনভিজ্ঞতা। তবে দৈবাৎ কোনও স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিতেন, এমন কথাও জানিতে পারা যায়।

দেশীয় শিল্পবিদ্যা ও কারুকার্য্যে অনেক মহিলাই সুশিক্ষিতা ছিলেন। কাঁথা, বুতি, ক্ষীরের ছাঁচ, খয়েরের বাগান, চুলের দড়ি, শিকা, ধানের হার, যবের হার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা সুন্দর শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেন। এই সকল জিনিষ দেখিতে যেরূপ সুন্দর, অনেক গুলি সেইরূপ প্রয়োজনে ও আসিত।

রুচি—মানব জীবন গঠন পক্ষে রুচি, এক প্রধান উপকরণ। যে জাতির রুচি যেরূপ পবিত্র ও উন্নত, তাহাদিগের সমাজও সেইরূপ পবিত্র ও উন্নত হইয়া থাকে। গত শতাব্দীর প্রথম যুগে ভার-তীয় স্ত্রী পুরুষদিগের রুচির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সন্তোষজনক নহে।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বোধ হয়, মানবের রুচি দুই ভাগে বিভক্ত। মানবের শিল্প, চিত্র, সঙ্গীত ও সাহিত্যে রুচির যে ভাগ প্রকাশিত হয়, সে ভাগ রুচির আন্তরিক ভাগ; আর বেশ, ভূষা, আলাপাদিতে রুচির যে ভাগ প্রকাশিত হয়, সেভাগ রুচির বাহ্যিক ভাগ। যাঁহারা ভারতের ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত, তাঁহাদের অবশ্য স্মরণ আছে যে চৈতন্যদেব-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবনতির সহিত বাঙ্গালার বিশুদ্ধ রুচিও প্রায় দূর হইয়াছিল। বাঙ্গালীর শিল্প, চিত্র যেমনই হউক, বাঙ্গালির সঙ্গীত, সাহিত্য বড়ই কুরুচি পূর্ণ ছিল। তখন-কার তরজা প্রভৃতি সঙ্গীতে রুচিদোষ বহুল প্রমাণে লক্ষিত হইত; তখনকার সাহিত্যে—বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য জন্মিত না, পদ্যলেখকগণ অনেকেই জয়দেব, বিদ্যাপতি, ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব কবিগণের ভাব ও ভাষা লালিত্যে মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালা ভাষার কপাল পোড়াইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অনেক ক্ষমতা-পন্ন কৃতী গ্রন্থকারও ভদ্রলোকের অপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিতেন। বড় দুঃখের বিষয় সেই সকল সঙ্গীত ও সাহিত্য নিরা-পত্তিতে অনেক ভদ্র সমাজে গৃহীত হইত। ইহা যে অবনতির পরিচায়ক, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। *

* রুচির কথা বলিতে এখনও লজ্জা করে। গৃহস্থ বাড়ীতে এখনও বাই নাচ, খেম্‌টা নাচ প্রচলিত। তবে সেকালের তুলনায় অনেকটা উন্নত বটে।

স্বর সাধন প্রণালী।

(৩৫৩ সংখ্যা ২৪৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ কৃত গীত।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বরলিপি।

কীর্ত্তন—তাল দশকুশী। *

+।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
ঋ	গ	প	ম	গ	গ	ঋ	গ	গ	গ	ম	গ
ব-	ড়	সা-	ধ	ম-	নে,	হৃ-	দ	য়	র-	ত-	নে,

+।	।	।	।	।	।	।	।	। ॥
সা	সা	ঋ	গ	ঋ	সা	ঋ	ঋ	গ ঋ
(আ-	মার)	হৃ-	দ-	য়	মা-	ঝা-	রে	পাই।

+।	।	।	।	।	।		।	।	।	।	।	।
ঋ	গ	প	ম	গ	গ		প	ধ	নি	ধ	ধ	ধ
ব-	ড়	সা-	ধ	ম-	নে,	(১ম বার)	ব-	ল,	বু-	দ্ধি,	ম-	ন,
						(২য় বার)	সে	প্রে-	ম	সা-	গ-	রে,
						(৩য় বার)	শ্রী-	প-	দে	বি-	কা	ব,

---

* আমরা পুর্ব্ব পত্রিকায় একটী আগমনী গীতের স্বরলিপি দিয়াছি, এই পত্রিকায় একটী কীর্ত্তনের গীত দিলাম।

দশকুশী তালটী বার মাত্রা যুক্ত, তন্মধ্যে সাতটী আঘাত ও পাঁচটী ফাক। ঠেকা যথা,—

÷।	৩।	০।	৪।	০।	৫।	০।	৬।
ধা	ধিনাক্‌ধিনা	ধিনাক্	ধিনাক্‌ধিনা	ধিনাক্	ধিনা	তিনাক্	তিনাক্‌তিনা

০।	৭।	০	১।
তিনাক্	তিনাক্‌তিনা	তিন্নাক্	তিনা

শারদীয় পূজার সময়ে ভগবতীর কৈলাস হইতে হিমালয়ে আগমন সম্বন্ধীয় গানকে আগমনী কহে। ষষ্ঠির দিন দুর্গা, কৈলাস ত্যাগ করিয়া, সপ্তমীর দিন মাতৃগৃহে তিন দিন বাস করিয়া দশমীর দিন আবার কৈলাসে চলিয়া যান। ভগবতী সম্বৎসর কৈলাসে থাকেন, তজ্জন্য মেনকা, দুর্গার পুনর্ব্বার আগমন সময়ে বাৎসল্যভাবে নানাপ্রকার দুঃখ করেন। পূর্ব্বে কবির দলে দুর্গা পূজার সময়ে আগমনী গানের সৃষ্টি হয়, পরে পাঁচালীতেও ইহার প্রচলন হইয়া পড়ে।

হরিলীলা বিষয়ক গীতকে কীর্ত্তন বলে। অপর গীত অপেক্ষা ইহার সুর অন্যরূপ। কীর্ত্তনের সুরের মধ্যে মনোহরসাহী উৎকৃষ্ট।

+।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
প	সা'	নি	ধ	নি	প	প	ধ	প	ম	প	গ
জী-	ব-	ন,	যৌ-	ব-	ন,	নি-	জে-	র	কি	ছু	যে
জ-	ন-	মে-	র	ত-	রে,	ম-	গ-	ন	হ	ই	তে
দা-	স	হ-	য়ে	র-	ব,	প-	রা	ণ	সঁ-	পি	ব

+। ।।।	।	।	।	।।	।	।।	+।	।	।	।	।
গ ঋ	ঋ	ঋ	গ	প	ধ	নি	প	ধ	প	ম	প
না ই.-	আ-	মি	হৃ-	দয়	না	থেরে	নি-	জে-	র	কি	ছু
চা ই,-	আ-	মি	সঁ-	তার	ভু	লে,	ম	গ	ন	হ-	ই
ভাই,-	প্র-	ভুর	অ-	ভয়	প-	দে.	প-	রা	ণ	সঁ-	পি

।	।।	।	।
গ	গ ঋ	ঋ	ঋ
যে	নাই,-	(আ-	মি)
তে	চাই!	(আ-	মি)
ব	ভাই!		

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৫৯ সংখ্যা ২৪০ পৃষ্ঠার পর)

রক্তপিত্ত।

প্রতিদিন নবদূর্ব্বার রস পানে রক্ত-রোগের রক্ত বমনাদি নিবারণ হয়।

২। কিসমিস ভিজান জলপান ও কিস্‌মিস ভক্ষণ করিলে রক্তপিত্ত রোগে উপকার দর্শে।

৩। মধু ১৬ তোলা, শীতল জল ১৬ তোলা, একত্র যোগ করিয়া রক্তপিত্ত রোগীকে প্রতিদিন পান করাইলে, ভয়ঙ্কর রক্তপিত্ত বমনাদিসহ রক্তপিত্ত রোগের উপশম হয়।

৪। প্রতিদিন কিস্‌মিস্‌ ভিজান জলপান ও কিস্‌মিস ভক্ষণ কিম্বা ডুম্বুর সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ মধুসহ পান করিলে রক্তপিত্তাদি রোগের রক্তস্রাব বন্দ হয়।

৫। সাজো গোবরের রস নস্য করিলে, নাসিকা, মুখ, চক্ষু ইত্যাদি দ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে,তাহার সত্বর উপশম হয়।

৬। গান্ধারির শিকড় এক আনা পরিমাণ ভালরূপে ধুইয়া বাটিয়া খাইলে রক্তপিত্ত ভাল হয়।

৭। আধছটাক কচি যজ্ঞডুম্বুরের রস আধ ছটাক খাঁটি গোলাপজল একত্রে মিশ্রিত করিয়া দুই দিবস প্রাতে খাইলে রক্তবমন নিবারণ হয়।

কাশি।

১। আদার রস একতোলা মধুর সহিত সেবন করিলে সর্দ্দি ও কাশি নিবারিত হয়।

২। কন্টীকারীর রসে অথবা বাসক ছালের রসে পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কিম্বা তুলসী পত্রের রস মরিচের গুঁড়াসহ সেবনে কাশ রোগের উপশম হয়।

৩। মুখে গঁদ ও মিছরী কিম্বা হরীতকী ও যষ্টিমধু অথবা লবঙ্গ বা কাবাব চিনি রাখিলে কাশির বেগ শান্তি হয়।

৪। বুকে সর্দ্দি বসিলে পুরাতন ঘৃত কণ্ঠদেশে মালিস করিবে, কিম্বা একটী পাতিলেবু গোবরের ভিতর করিয়া পোড়াইবে, এবং সেই লেবু ও পুরাতন ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া বুকে মালিস করিলে উপকার হয়। বুকে বেদনা হইলে পুরাতন ঘৃতে আদার রস ও কর্পূর মিশাইয়া মালিস করিবে। গরম দুগ্ধের সহিত গাওয়া ঘৃত অল্প করিয়া সেবন করিলে সর্দ্দি ও কাশির লাঘব হয়।

৫। বাসক পাতার রস কাঁচ্চা খানেক লইয়া সেইরূপে কাশীর চিনি মিশ্রিত করিয়া তিন চারি দিন খাইলে কাশি ভাল হয়।

৬। পুষ্করিণীর পাড়ের আমগাছের অর্দ্ধ জলপচা পাতা দিয়া নূতন হাঁড়িতে এক সের জল সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ সের থাকিতে নামাইয়া ২।৩ দিন খাইলে কাশি ভাল হয়।

৭। কাবাবচিনি পানের সহিত ২।৪ দিন খাইলে কিম্বা মিছরি ও মরিচ এক সঙ্গে মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া খাইলে কাশি ভাল হয়।

৮। কাশিজনিত কষ্ট হইলে খোসা ছাড়াইয়া আদার গোল গোল কুচি একটী শলাতে গাথিয়া তাহাতে লবণ মাখাইবে। পরে প্রদীপের শিশে বেশ করিয়া পোড়াইয়া আদা চিবাইয়া খাইলে কাশি ভাল হয়।

৯। আকরকরা বচ সর্ব্বদা মুখে রাখিলে, কিম্বা সর্ব্বদা গঁদ চুষিলে সামান্য কাশ নিবারণ হয়।

১০। ঈষদুষ্ণ গব্যঘৃত, গোলমরিচ চূর্ণ, আদার রস, এই সকল দ্রব্য একত্র যোগ করিয়া সেবন করিলে, কাশ, সর্দ্দি-বসা, গলাখুস্‌খুসনি, স্বরভঙ্গ সত্বর আরাম হয়।

১১। বাসকছাল, বামনহাটী, যষ্টি-মধু, কন্টীকারী, বচ, কুড়, তালিশপত্র, পিপুল, কটফল, কাঁকড়ারশৃঙ্গী প্রভৃতির কাথ, বংশলোচন, তুলসীপত্র, পান ও আদার রস প্রভৃতি কাশ ও প্রতিশ্যায় নিবারক দ্রব্য।

চীন সম্রাটের প্রার্থনা।

অনেকেই জানেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিক ধর্ম্ম। বৌদ্ধেরা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা কেহ আছেন এরূপ বিশ্বাস করেন না, জীবন্ত কর্ম্মশীল পরমেশ্বরের উপাসনা করেন না ও তাঁহার সঙ্গে ঐহিক বা পারত্রিক কোনও সম্বন্ধ আছে স্বীকার করেন না। কিন্তু সুবিশাল চীন সাম্রাজ্যের বৌদ্ধ প্রজামণ্ডলীর অধিনায়ক চীনসম্রাট সিংহাসন আরোহণকালে যে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পণ্ডিতপ্রবর ভট্ট মোক্ষমূলর চীনদেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই পুস্তক হইতে চীন সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণ কালীন নিম্নলিখিত প্রার্থনাটী অনুবাদিত হইলঃ—

"হে লীলাময় প্রভো, তোমারই দিকে আমার চিন্তাকে নিয়োজিত করিতেছি। এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড তোমার অপার মহিমা প্রচার করিতেছে। হে প্রভো, আমি তোমার দাস, একটু সামান্য তৃণের মত কত ক্ষুদ্র! আমার হৃদয় পিপীলিকার ক্ষুদ্রহৃদয়ের মত! কিন্তু তথাচ তুমি তোমার কৃপাহইতে বঞ্চিত না করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবকে এই বৃহৎ সাম্রাজ্য শাসনের ভার দিয়াছ! আমার অজ্ঞতা ও অন্ধতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ আছি। আমার ভয় হইতেছে যে, পাছে তোমার দয়ালাভে অযোগ্য হই। সেইজন্য আমি সাধ্যমতে বিধি-ব্যবস্থায় অধীন হইয়া কার্য্য করিব।"

"আমি তোমার স্বর্গীয় আলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি। তোমার মহার্ঘ যানে আরোহণ করিয়া আমার এই মন্দিরে আবির্ভূত হও। হে দয়াময়! তোমার চরণে আমার মস্তক অবনত করিতেছি, তুমি আমাকে কৃপা কর। তোমার পূজার জন্য, তোমার চরণতলে এই ভৃত্য পারিষদগণসহ উপস্থিত হইয়াছে। মৃত আত্মাগণ শূন্যদেশে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, তোমার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। হে ঈশ্বর! আমি তোমার সেবক, তোমার চরণতলে পতিত হইয়া ভক্তির সহিত তোমাকে নমস্কার করিতেছি। তোমার সহবাসের জন্য তোমার দিকে মন নিয়োগ করিতেছি। হে প্রভো, তুমি আমার নৈবেদ্য সকল গ্রহণ কর; আমার প্রতি তুমি করুণা কর; তোমার অপার করুণায় আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।"

"তুমি বলিয়াছ যে, তুমি আমাদের প্রার্থনা শুনিবে। তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ। তোমার সন্তান হইয়াও আমি তোমার প্রতি প্রকৃত ভক্তি অর্পণ

করিতে অসমর্থ, কেননা আমি অজ্ঞ ও উদ্যমবিহীন।"

"হে প্রভো! তুমি আমার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াছ, তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি। তোমার নাম মহান্। ধন্যবাদ ও ভক্তির সহিত তোমার চরণতলে পতিত হইতেছি। কোকিল যেমন নববসন্ত সমাগমে আনন্দিত হয়, সেইরূপ আনন্দের সহিত তোমার চরণতলে এই বহুমূল্য রত্ন ও বস্ত্রাদি রাখিয়া তোমার প্রেমের কথা প্রচার করিতেছি।"

যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করেন না, কেবল 'শূন্যবাদ' লইয়া যাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম, তাঁহাদের হৃদয় হইতে কি এরূপ প্রার্থনা উত্থিত হইতে পারে? চীনসম্রাটের এই প্রার্থনাদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বৌদ্ধসমাজ মতে নাস্তিকতা প্রকাশ করিলেও কার্য্যত ঈশ্বরবিশ্বাসী। আস্তিক চীনসম্রাটের ভাব ও ভক্তিপূর্ণ এই মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে নাস্তিক ধর্ম্ম বলিতে আর কাহারও সাহস হইবে না।

মাঘ।

খনা বলিয়াছেন,—

"ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ॥"

এ কথা অতি সার। কারণ প্রকৃত পক্ষে মাঘ মাসই সম্বৎসরের চাস আবাদ আরম্ভের সময়। ঐ মাসে জল হউক বা নাই হউক, কৃষকদিগকে চাস আবাদের কিছু না কিছু আয়োজন করিতেই হয়। তাহার উপর যদি ঐ মাসের শেষ ভাগে বৃষ্টি হয়, তাহাহইলে "সোণায় সোহাগা" হয়। আমাদের প্রধান খাদ্য ধান্য, তাহার আবাদ চৈত্রের শেষে, কিম্বা বৈশাখের প্রথমে করিতে হয়। সেই ধানের জমির প্রথম চাস মাঘ মাসে হইয়া থাকে। পাট, শণ, কচু, অরহর, হরিদ্রা প্রভৃতি নানাবিধ প্রধান প্রধান ফসল, যাহাদিগের চাস আবাদ বৈশাখ মাসে হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ের জমির প্রথম চাস এই মাঘ মাসে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আলু, কপি, পলাণ্ডু প্রভৃতি যে সকল উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্ ফসল হইয়া থাকে, তাহার আয়োজনও এই মাঘ মাস হইতে করিতে হয়।

বর্ষাকালে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের চারা ভূমিতে রোপণ করিতে হয়, এই মাঘ মাসে উহাদিগের জন্য যথাস্থানে দেড় বা দুই হস্ত গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া খনিত মৃত্তিকা ঐ গর্ত্তের চতুঃপার্শ্বে কিছু দিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। রৌদ্র ও

বায়ু খাইয়া ঐ সকল মাটী উর্ব্বর ও শিথিল হইলে মৃত্তিকার বিপর্য্যয় করিয়া অর্থাৎ উপরের মাটী নীচে এবং নিম্নের মাটী উপরে দিয়া ঐ গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। উহার সহিত কিছু সার মিশ্রিত করিয়া দিলেও ভাল হয়। বর্ষাকালে যে সকল ফসল করিতে হয়, এই মাসে তাহাদের ভূমিতে যথাযোগ্য সার দিয়া রাখিতে হয়। ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী শুষ্ক বিল, খাল, বা অন্যবিধ জলাশয় হইতে পলি তুলিয়া আলু, কপি, ও পলাণ্ডুর ক্ষেত্রে দিতে হয়। ঐ পলিমাটী দিয়া পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দ্বারা সকল মাটীকে উলট্ পালট্ করিয়া জমিগুলিকে এরূপে রক্ষা করিতে হয় যেন তাহাতে একটীও তৃণ বা আগাছা না জন্মে।

ওল,—এই মাস হইতেই ইহার চাস আবাদ আরম্ভ করিতে হয়।

ইক্ষু,—এই মাস হইতেই ইক্ষু ছেদন ও তদ্দারা গুড় প্রস্তুতীকরণ আরব্ধ হইয়া থাকে।

মূলার বীজ,—এই মাসে মূলার যতদূর পরিপুষ্টি হইতে পারে; তাহা হইয়া থাকে। বেশ মোটা ও পুষ্ট মূলার অগ্রভাগ কর্ত্তন করিয়া মাটীতে রোপণ করিলে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট বীজ জন্মিয়া থাকে। কোন কোন কৃষক ফল ধরিবার অগ্রে ঐরূপ মূলার অগ্রভাগের দিকে চারি অঙ্গুলি কাটিয়া তাহাতে খোল করেন এবং ঐ খোল পূর্ণ করিয়া জল দিয়া তাহাকে অধঃশাখ ভাবে টাঙ্গাইয়া রাখেন। প্রতিদিন ঐ খোল পূর্ণ করিয়া জল দিতে হয়। তাহার পত্র ও শীষগুলি ক্রমশঃ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে এবং তাহা হইতেও উত্তম বীজ জন্মিয়া থাকে। মৃত্তিকা প্রোথিত মূলা অপেক্ষা ঐরূপে লম্বমান মূলা হইতে যে বীজ জন্মে তাহা উৎকৃষ্টতর এরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। আমরাও তাহা বিশ্বাস করি। মূলার বীজ যতই পুরাতন হয়, তাহা ফসলাংশে ততই উপযোগী হইয়া থাকে।

হলুদ ও আদা,—এই মাসের শেষ ভাগ হইতেই তাহা ক্ষেত্র হইতে তুলিতে আরম্ভ করে এবং হলুদের মোতা ও আদার মুখী ভবিষ্যৎ বীজের জন্য গাছের ছায়ায় তৃণ পত্রাদির আচ্ছাদন দিয়া রাখিয়া দেয়। যাহাদিগের অধিক হলুদের চাস আছে, তাহারা অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগ হইতেই হলুদ তুলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই মাসের পূর্ব্বে হলুদ তুলিলে ফসলে কিছু কম হয়, তেমন হলুদ দমে ভারী হয়। তুলিতে যত বিলম্ব হয়, ফসল তত বেশী হয়, কিন্তু ওজনে হাল্‌কা হয়। হলুদ ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া প্রথমতঃ গোবর মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিতে হয় এবং পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। উনানে চড়াইবার পর একবার উতলাইয়া উঠিলেই নামাইতে হয়, নচেৎ অধিক সিদ্ধ হইলে হলুদ নষ্ট হইয়া যায়। অর্দ্ধ শুষ্ক হইলেই তাহা

চট্ কিম্বা বাঁশের চাটাইর উপর রাখিয়া প্রতিদিন অপরাহ্ণে একবার রগ্‌ড়াইতে হয়। পূর্ব্ব দেশের কৃষকেরা একখানি বাঁশ বা কাষ্ঠ লগুড়ের অগ্রভাগে একখণ্ড ক্ষুদ্র তক্তা যুড়িয়া তদ্দ্বারা হলুদ রগ্‌ড়াইয়া থাকে। হলুদ যত রগ্‌ড়াইতে পারা যায় শুঁঠ হলুদ ততই গোলাকার, শক্ত, পরিষ্কৃত, অনাবৃত ও ভারবিশিষ্ট হইয়া থাকে। উত্তমরূপে শুকাইতে ও রগ্‌ড়াইতে পারিলেই উত্তম হলুদ প্রস্তুত হয়। হলুদের চাস আবাদে বিঘা প্রতি ২০৲।২৫৲ টাকা খরচ করিয়াও ৫০৲ টাকা লাভ থাকিতে পারে। আমরা এই লাভজনক ফসলের বিশেষ বিবরণ পুনরায় প্রকাশ করিব। আদার মূখী পোঁতা, যথাকালে তোলা, ছায়াযুক্ত স্থানে যত্নে রাখা এবং আবশ্যক মতে ব্যবহার করা, বা অধিক থাকে ত বিক্রয় করা ভিন্ন উহাতে কোন ঝঞ্ঝাট কাজ নাই, অথচ লাভ বিলক্ষণ আছে। আমরা আদার বিশেষ কথাও পরে বলিব।

কুল, পিয়ারাদি ফল,—ইহাদিগের পুরাতন ডাল কাটিয়া দিতে হয়। নহিলে পুরাণ ডালের ফল ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে।

বেল, মল্লিকাদি ফুল,—ইহাদিগের পুরাতন পাকা শাখা সকল কাটিয়া ফেলিতে হয়। শাখা কাটিয়া দিলে নূতন তেজাল ডাল বাহির হয় এবং তাহাতে উৎকৃষ্ট ফুল হয়। ঐ সকল কর্ত্তিত শাখা দ্বারাই শাখা কলম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সর্ষপ ও মাঠ কড়াই,—এই মাসে সর্ষপ মাড়িয়া ঝাড়িয়া এবং মাঠকড়াই কাটিয়া ফসল সংগ্রহ করিতে হয়।

ধান,—এই মাসে ধান কাটিলে ফসল পাওয়া যায় না, কেবল নাড়া হয়।

আমরা মাঘ মাসের বিবরণ শেষ করিবার পূর্ব্বে একটী অঙ্গীকারপালনে বাধ্য আছি। অগ্রহায়ণ মাসের বামাবোধিনীতে লিখিয়াছি যে, তামাকের চাস, পাইট্ ও প্রস্তুতী করণ এই তিনটী ক্রিয়ার মধ্যে পাইট পৌষ মাসের বিবরণ সহ প্রকাশিত হইল, প্রস্তুতীকরণ প্রণালী মাঘ মাসের বিবরণের সহিত প্রকাশিত হইবে। অতএব তামাক কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাই এস্থলে লিখিত হইবে।

মাঘ মাসের শেষ ভাগে কিম্বা ফাল্গুন মাসের প্রথমাংশে তামাকের পাতার চরম পাক হইয়া থাকে। তবে ঋতুর ব্যতিক্রমে, বা বর্ষার অগ্রপশ্চাতে কথঞ্চিৎ উহার ব্যতিক্রমও হইতে পারে। কিন্তু প্রায়ই ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তামাকের পাতা পাকিয়া ঈষৎ লাল হয়। তখন তাহা কাটিতে হয়। তামাকের পাতা গুলি এরূপ কৌশলে কাটিতে হয় যেন পত্রগ্রন্থির (কাণ্ডের যে স্থান হইতে পত্র নির্গত হয়) কিয়দংশ ঐ তামাক পত্রের সহিত থাকিয়া যায়, তাহাতে হালা বাঁধিবার সুবিধা হয়। সুবিধা এই, ঐ গ্রন্থি হালার দড়িতে বেশ বাধিয়া থাকে; নচেৎ

পত্র সকল হালার রন্ধ্র হইতে স্খলিত হইয়া যাইতে পারে। তামাক কাটিয়া কয়েক দিন ক্ষেত্রেই ফেলিয়া রাখিতে হয়। পত্র সকলকে শুষ্ক করাই ক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখার উদ্দেশ্য। কিন্তু শুষ্ক করা উদ্দেশ্য হইলেও একটু রস থাকিতে থাকিতেই পত্রসকলকে গৃহে আনিতে হয়। অনন্তর চারিটী চারিটী পাতা একত্র করিয়া বাঁশ কিম্বা দড়ার উপর শুকাইতে হয়। ঐ শুষ্কীকরণ কার্য্য এরূপ স্থানে করিতে হইবে, যেখানে দিনমানে রৌদ্র, রাত্রে শিশির লাগিতে পারে। ঐ তামাকের উপর যাহাতে ঝড় বৃষ্টি লাগিতে না পায়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। এইরূপ ৩।৪ দিন শুষ্ক হইলে তামাকে "থাঁত" দিতে হয়।

তামাকের "থাঁত" আবার কি? এস্থলে তাহাও বলিতে হইবে। একখানি বা যত গুলি মই আবশ্যক হয়, তাহার উপর তামাক সাজাইতে হয়। ঐ সজ্জীকরণে একটু কৌশল আছে। প্রত্যেক তামাক পত্রের গোড়া গুলি মইয়ের পার্শ্বে এবং অগ্র ভাগ মইয়ের মধ্যে থাকা চাই। প্রথমে তামাকের গোড়া গুলি মইয়ের একধারে রাখিয়া সাজাইবে। পরে অন্য ধারে গোড়া রাখিয়া সাজাইতে হইবে। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে উপর্য্যুপরি মইয়ের উপর তামাক সাজাইয়া ঠিক তাহার মধ্য স্থলে এক খানি বাঁশ দিয়া বাঁশের মই প্রান্ত মইয়ের সহিত বদ্ধ করিতে হয়। তাহাতে তামাক পত্রগুলি চাপ পাইয়া পাটে পাটে চাপিয়া যায়, ইহাকেই তামাকের "থাঁত" কহে। এই সকল কার্য্য অতি প্রত্যূষে বা কোয়াসার দিন ভিন্ন হইতেই পারে না, অন্য সময়ে করিলে তামাক গুঁড়া নাড়া হইয়া নষ্ট হয়। তামাক প্রস্তুতীকরণ অলস কৃষকের কর্ম্ম নহে,—ইহাতে বিলক্ষণ উদ্যম ও ক্ষিপ্রকারিতা আবশ্যক।

এই রূপে ২।৩ দিবস "থাঁতে" রাখিয়া পুনরায় খুলিয়া পূর্ব্ববৎ বাঁশের উপর শুকাইতে হয়। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে তামাক সকল ঘরের মধ্যে মাচার উপর উপর্য্যুপরি সাজাইতে হয়। ১০।১২ দিবস এই ভাবে রাখিয়া পরে "হালা" "ঝাড়া" বা "গোছা" রূপে বাঁধিতে হয়। অনন্তর তাহাদের উপরে ও নীচে এক এক খণ্ড চট্ দিয়া প্যাক্ করিলেই তামাকের "পাটী" বা "হালা" প্রস্তুত হয়। ইহাই উৎকৃষ্ট বাণিজ্য দ্রব্য রূপে গাড়ী, নৌকা, ইত্যাদি যোগে নানা স্থানে প্রেরিত হয়। ঐ "পাটী" বা "হালার" আকার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলের মতিহার, হাতীকাণী প্রভৃতি বড় বড় তামাকের পাটি কাষ্ঠের অষ্টিকার ন্যায় করিয়া বাঁধা হয় এবং তাহাদের গোঁজ গুলি এক দিকে ও চটের বাহিরে থাকে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের নানা স্থানে

"হিঙ্গলি" নামক একপ্রকার উৎকৃষ্ট তামাকের চাস আবাদ হইয়া থাকে। তাহার প্রস্তুতীকরণ প্রণালী একটু স্বতন্ত্র। আমরা পূর্ব্বে যে প্রণালীর বর্ণন করিলাম, তাহার অধিকাংশ রাজসাহী ও ঢাকা বিভাগের। "হিঙ্গলি" তামাক কাটিয়া "খোলায়" শুষ্ক করে। যেমন যে স্থানে ধান্যাদি শস্যের ঝাড়াই মাড়াই হয়, তাহাকে "খামার" কহে, তেমনি তামাকের খামারকে "খোলা" কহে। তাহা কৃষি ক্ষেত্রের মধ্যেই নির্ম্মিত হয়। খোলায় তামাক শুকাইতে ২দিন হইতে ৪ দিনের অধিক লাগে না। তামাকের পাতা গুলি সুপক্ক হইলে শুষ্ক হইতে অধিক রৌদ্র লাগে না। যে গুলি অপেক্ষাকৃত কাঁচা থাকে, তাহা শুষ্ক করিতে অধিক রৌদ্র আবশ্যক হয়। হিঙ্গলি তামাক গাছ শুদ্ধ শুকাইতে দেয়। শুষ্ক হওয়ার পর একপ্রকার দন্তহীন কাস্তিয়া দ্বারা তাহা কর্ত্তন করে। প্রত্যেক খণ্ডে ২টী হইতে ৪টি পাতা রাখে। পরে তাহা গৃহে লইয়া গিয়া গোশালায়, বা শূন্য ঘরে খড়ের দড়ির উপর শুকাইতে দেয়। সেই ভাবে প্রায় এক কি দেড় মাস থাকে। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পাটী বা হালা বাঁধে।

এই বিবরণ পাঠের পর হয় ত কোন কোন পাঠক পাঠিকার তামাকের বিবিধ নাম শুনিবার ইচ্ছা হইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন বঙ্গকবি বলিয়াছেন,—

"কেনা শুনাইবে ঐ নাম।
না জানি কতেক মধু, ঐ নামে আছেগো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"

চণ্ডী দাস।

অতএব গোপাল সহস্র নামের ন্যায় তামাক সহস্র নামের গাথা হইতে পারে। এস্থলে নমুনা স্বরূপ কয়েকটী নাম দেওয়া গেলঃ—

(১) পানমুটী, (২) হরিণপানী, (৩) হাতিকানী, (৪) জটাভাং বা শিবজটা, (৫) কপি, (৬) শকুনকানী, (৭) কালীজিবে, (৮) ছোটনা, (৯) কৃষ্ণকলি, (১০) মান্ধাতা, (১১) সিন্দুর খটুয়া, (১২) ভেলেঙ্গি, (১৩) চামা, (১৪) ময়ো খোল ইত্যাদি। *

মহীশূরের মহারাজার মৃত্যু উপলক্ষে। (১)

কি কঠিন হিয়া তোর—নিঠুর শমন,
অকূলের নিধি মা'র করিলি হরণ।
কোল হ'তে কেড়ে নিলি দ্বিতীয়ার চাঁদ,
তাই বুঝি পেতে ছিলি মৃত্যু রূপী ফাঁদ?
শ্রীহীন করিলি আজ শ্রীরঙ্গপটন,
শূন্য হ'ল এতদিনে রাজসিংহাসন।
সতীর মাথার মণি—কবরীর ফুল,
কেড়ে নিলি অকস্মাৎ বুকে বিঁধে শূল।
নিষাদ শরেতে বিদ্ধ বিহঙ্গিনী প্রায়,
ছট্ ফট্ করে সতী মরম ব্যথায়।

* পণ্ডিত শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত কৃষি শিক্ষা দেখ।

(১) যে মহারাজার আগমন সংবাদ দিয়া আমরা

বিষাদ-কালিমা মাখা ওমুখ কমলে,
রাহুগ্রস্ত শশী যেন শোভিছে ভূতলে!
পতিশোকে একেবারে সুখশান্তিহারা,
নয়নে বহিছে শত যমুনার ধারা।
গভীর আঁধার ঘরে ঘেরেছে হৃদয়,
সুখের তপন আর হবে কি উদয়?
প্রবাসের সুখ যত ফুরাইল সব,
আবাসে চলেছে সতী মুখে নাই রব!
পতি-সহ গৃহবাস—আশার স্বপন,
ভাঙ্গিয়াছে একেবারে নিষ্ঠুর শমন।
কি কাজ সাম্রাজ্যে তার—পতি নাই যার,
সংসার শ্মশান তুল্য—অনিত্য অসার।
সঙ্গিনী পতির ভস্ম রেখে বঙ্গদেশে,
দেশে যায় একাকিনী কাঙ্গালিনী বেশে!
কে লঙ্ঘিবে বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান,
তাঁর কাছে রাজা প্রজা সকলি সমান!
আশা ও ভরসা কত—কত আকিঞ্চন,
অকূল সমুদ্র তলে হলো নিমগন।
মরতে অমরাবতী পুরী মহীশূর,
আনন্দ আহ্লাদে সদা ছিল ভরপুর;
রাজার অকাল মৃত্যু বার্ত্তা ভয়ঙ্কর,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত মাথার উপর।
লক্ষ লক্ষ প্রজা আজি লুটায়ে ভূতলে,
ভাসাইছে মহীশূর নয়নের জলে।
কত সুখ ভুঞ্জিয়াছে রাজার শাসনে,
সকলি জাগিছে আজ তাহাদের মনে।
রাম রাজ্যে যেন তারা করিয়াছে বাস;
জগৎ যুড়িয়া যাঁর যশ সুপ্রকাশ,
এমন রাজারে কাল করিলি হরণ,
কে আছে নিষ্ঠুর হেন তোমার মতন?
অপগণ্ড শিশু আজ হয়ে পিতৃহীন,
দীন হ'তে সেও যেন হইয়াছে দীন।
রাজ্যসুখ ধন মান অতুল সম্পদ,
সব হ'তে শ্রেষ্ঠতর জনকের পদ।
সে পদ সেবনে যেবা না পায় সুযোগ,
রাজ্যভোগ তার কাছে করমের ভোগ।
ধৈরয ধরিয়ে এবে শান্ত হও রাণী,
ওই শোন কাণপেতে বিধাতার বাণী?
"পতিশোকে সতী কেন হইছ কাতর?
দেব লোকে আজি তাঁর মহা সমাদর।
প্রবাস ছাড়িয়া যেবা যায় নিজ বাসে,
ডেকে ল'ন বিশ্বমাতা আপনার পাশে।
জরা মৃত্যু নাহি সেথা,—আনন্দবাজার,
যাইতেছে কত যাত্রী হয়ে ভব পার।
সেথায় বসন্ত চির বিরাজে কেবলি
বহিছে মলয়ানিল ঝঙ্কারিছে অলি।
বিকসিত পারিজাত অতুল মাধুরী,
কি সুন্দর মরি মরি!—সে অমরাপুরী!
দেব পতি, মর্ত্ত্যে তব সেবীর জীবন,
কিছু দিন পরে পুনঃ হইবে মিলন।
যে ব্রত নিয়েছ সতী—পাল কায় মনে,
জ্ঞানে ধর্ম্মে শান্তি সুখে পাল প্রজা গণে।
মহীশূর 'মহীশূর-মাহষীর' গুণে,
কতই আনন্দ হয় ওই কথা শুনে!
'স্বর্গদেবী' মহীশূরে করিছেন বাস,
এই কথা কোটিকণ্ঠে করুক প্রকাশ!!

শ্রীচ—

আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলাম, বিধির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে তিনি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া রাজধানীকে ও ভারতকে শোকাচ্ছন্ন করিয়াছেন। জগদীশ তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারকে শান্ত করুন।

আশ্চর্য্য রবকারী পক্ষী।

শুক তোতা প্রভৃতি পাখী মানুষের কথা শুনিয়া তাহার নকল করিতে পারে, ইহা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু এমন কতক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা স্বভাবতঃ মানুষের বুলী বলিয়া থাকে। আমাদের দেশে 'বউ কথা ক' পক্ষী বউ কথা ক বা গৃহস্থদের খোকা হোক্ বলিয়া থাকে। ভোতল নামে এক ভয়ঙ্করমূর্ত্তি পক্ষী আছে, তাহারা রাত্রিকালে উচ্চ বৃক্ষে বসিয়া খোঁখরা স্বরে "কি দিবি কি বউ দিবি" বলিয়া বার বার ডাকিতে থাকে, না তাড়াইলে উড়িয়া যায় না। কড়্কড়ে নামক আর এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারাও রাত্রিকালে উচ্চবৃক্ষ বা গৃহের চূড়ায় বসিয়া "কড় কড় কড় কড় কড়াৎ" বার বার এই শব্দ করে এবং শঙ্খ বাজাইয়া বা ঢিল ছুড়িয়া ইহাদিগকে তাড়াইতে হয়। ভোতল ও কড়্কড়ে পক্ষী 'অলক্ষণে' বলিয়া খ্যাত, ইহারা যে গৃহের নিকটে বসিয়া ডাকে, সে গৃহে অনেক সময় মৃত্যুঘটনা হইতে দেখা যায়। আমাদের চাতক "ফটিক জল" বলিয়া গ্রীষ্মকালে আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিয়া সকলের প্রাণকে শীতল করে।

আমেরিকায় অদ্ভুত রবকারী বিবিধ জাতীয় পক্ষী আছে। বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণ হররোলার সহিত বিশেষ পরিচিত। এই পক্ষী সকল প্রকার পক্ষীর ডাকের নকল করিয়া কত আমোদ করে। পেরুর জঙ্গলে টরোপিশু নামে পক্ষী দূরস্থ কুম্ভগর্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ করে। টনকুই রক্তবর্ণ, কৃষ্ণপক্ষ, সুন্দর পক্ষী, কিন্তু শূকরের মত "ঘোঁত ঘোঁত" করিয়া ডাকে। ডেমারারা প্রদেশে ছাগ-শোষক (Goat-sucker) নামক পক্ষী, মানুষ অতি শোকে যেমন "হা হা হা হা" করিয়া প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে পরে মৃদুস্বরে কাঁদিয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ ডাকে। উচ্চসুর ধরিয়া থামিয়া থামিয়া ক্রমে নরম সুরে ডাকে। ইহারা নিশাচর পক্ষী, পোকা মাকড় হইতে গোরু বাছুর রক্ষা করে। ওয়াটারটন নামক এক প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কতকগুলি পক্ষীর ডাক অনুসারে তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন। ইহারা স্পষ্টস্বরে এই ইংরাজী কথাগুলি বলে। হু আর ইউ পক্ষীর ডাক who are you? who, who, who, who are you? হু আর ইউ, হু হু হু হু আর ইউ? ইহারা এই ডাক ডাকিতে ডাকিতে দ্বারের কাছে আসিয়া কয়েক হাত উড়িয়া ৫।৬ হাত উচ্চস্থানে গিয়া বসে। ওয়ার্ক এওয়ে পক্ষী work away, work work work away, ওয়ার্ক এওয়ে, ওয়ার্ক ওয়ার্ক ওয়ার্ক এওয়ে বলিয়া ডাকে। আর এক জাতীয় পক্ষী

"Willy come go, willy willy willy come go" উইলী কম গো, উইলী উইলী উইলী কম গো করুণস্বরে এই কথা বলে। আর এক জাতীয় পক্ষী "Whip poor will, whip whip whip poor will" হুইপ পুওর উইল, হুইপ হুইপ হুইপ পুওর উইল বলিয়া ডাকিয়া থাকে।

সুন্দর পক্ষী যন্ত্রবাদক। ইহারা অর্গান বাজনার ন্যায় সুস্বর বর্ষণ করিয়া পেরুর নির্জ্জন বনপ্রদেশ আনন্দময় করে। এই স্বর এরূপ মুগ্ধকর যে পথিক ইহা শুনিয়া আসন্ন ঝটিকা বৃষ্টি ভুলিয়া থমকাইয়া দাঁড়ায়। সিলজিরো পক্ষী কণ্ঠ-সঙ্গীতে কিউবার পর্ব্বতময় প্রদেশকে প্রতিধ্বনিত করে। বুলবুল ইহার গানে পরাজিত হয়। ধনী গায়েনাবাসী শত শত মুদ্রা দিয়া এক একটী পক্ষী কিনিয়া থাকে। গায়েনার বাঁশী পক্ষী ও আমেরিকার চামচচঞ্চু পক্ষীর গানও সুমধুর।

হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।

(২৫৯ সংখ্যা ২৫৩ পৃষ্ঠার পর)

শরীর ভাল না থাকিলে কোনও ধর্ম্ম—কোনও কর্ত্তব্যকর্ম্ম পালন করা যায় না। শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধ করা হয়, সেই অপরাধের ফল স্বাস্থ্যভঙ্গ। বিশুদ্ধ জল, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, নিয়মিত স্নান, পান, আহার পরিশ্রম; ও ধর্ম্ম চিন্তাদির দ্বারা মনে শান্তি আনয়ন করিয়া শারীরিক নিয়মাদি রক্ষা করা উচিত।

বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সুমার্জ্জিত করিবে, কি কার্য্যের কি ফল তাহা বুঝিয়া লইবে, পরিজনগণ ও অন্যান্য পরিচিত লোকগণ কেকিসে পরিতুষ্ট হয়েন, তাহা জানিয়া লোককে পরিতুষ্ট করা কর্ত্তব্য কেন না—"জনস্যাশয়মালোচ্য যো যথা পরিতুষ্যতি। তং তথৈবানুবর্ত্তেত পরারাধনপণ্ডিতঃ॥" কোনও আশু বিপদ উপস্থিত হইলে অধৈর্য্য না হইয়া যাহাতে সেই বিপদহইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শৈশবহইতেই নীতি শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। সুনীতি ও উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা, জীবনের প্রত্যেক কর্ত্তব্য দেখাইয়া দেয়; কর্ত্তব্য কার্য্যে আদেশ ও উৎসাহ প্রদান করে; অনুচিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেয় না; কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা বুঝাইয়া দেয়; মনুষ্যকে সৎকর্ম্মের দিকে ও ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করে। নীতিকে সকল কার্য্যের ভিত্তি করিলে সমস্ত গুণগুলিই সুপ্রকাশিত হয়।

সুনীতি দ্বারা স্বভাবের গঠন করিতে হইবে। হীনচরিত্র ব্যক্তির কোনও

সৎকার্য্যে অধিকার নাই, আত্ম-সংযমদ্বারা মার্জ্জিত হইলে স্বভাব প্রোজ্জ্বল হইবে। স্বভাব গঠন করিলেই আপনাকে গঠন করা হয়, কেন না "অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবোমূর্দ্ধি বর্ত্ততে॥" অতএব সচ্চরিত্র রমণীগণ—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সত্য-পরায়ণতা, শ্রমশীলতা, মিতাচারিতা, অপক্ষপাতিতা, সংযতেন্দ্রিয়তা, পরসেবা-পরতা ও ত্যাগ প্রভৃতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উপযোগী গুণগুলি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিবেন।

লজ্জা রমণীকুলের উজ্জ্বল ও সুচারু-ভূষণ। লজ্জাহীনা রমণীর অন্যান্য সহস্র গুণ থাকিলেও তিনি কুসুমবিহীনা লতার ন্যায়, বারিশূন্য সরসীর ন্যায়, ছাদশূন্য ঘরের ন্যায় শোভা-বিহীন। চৌদ্দ হাত ঘোমটার মধ্যহইতে অট্ট-হাসির রোল বাহির হওয়া, ও একজন অপরিচিত লোক বা ভাসুর শ্বশুর দেখিলে থিয়েটারের পার্টিদের ন্যায় দুম দাম করিয়া গৃহমধ্যে পলায়ন করা প্রকৃত লজ্জা নহে; প্রকৃত লজ্জা মৃদুতা ও বিনয়-মাখা। কোন একটী বালক বালি-কাকে অপরিচিত লোকের নিকট আর-ক্তিম গণ্ডে, বিনতলোচনে, গদগদবচনে নিজ নখ খুঁটিতে খুঁটিতে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর করিতে দেখিলে যে লজ্জার প্রতি-মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়, সেই লজ্জার কথা বলিতেছি। শাশুড়ী ননদ ও অন্যান্য পরিবারগণের নামে মিথ্যা নিন্দাপূর্ণ চিঠি স্বামীর সকাশে প্রেরণ করিতে লজ্জা না হইয়া পীড়িত স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে যে লজ্জা অবতীর্ণ হয়েন, সে লজ্জার কথাও বলিতেছি না, বলি-তেছি, অসৎ কর্ম্ম করিতে যে লজ্জা হয়—স্বার্থের জন্য অন্যকে ক্লেশ দিতে যে লজ্জা হয়—গুরুজন সমক্ষে চাপল্য ও পরিহাসাদি প্রকাশ করিতে যে লজ্জা হয়—পরিজনগণের প্রতি অন্যায় আচরণ করিতে যে লজ্জা হয়—এক জনকে নিন্দিত করিবার জন্য মিথ্যা বলিতে যে লজ্জা হয়—বৃথা গর্ব্ব ও আত্মপ্রশংসা করিতে এবং শুনিতে যে লজ্জা হয়—অকারণে বহু পুরুষ সমক্ষে, অনাত্মীয় বা অপরিচিত পুরুষ সমক্ষে বাহির হইতে যে লজ্জা বোধ হয়, সেই লজ্জাই হিন্দু রমণীগণের প্রকৃত লজ্জা, রমণী গণের এই রূপ লজ্জায় বিভূষিতা হওয়া কর্ত্তব্য।

সংসারে ঈশ্বরই সকলের প্রধান আরাধ্য। ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস ও ভক্তি রাখিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে। যেমন বাজীকরগণ মস্তকে কলসী স্থাপন করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি চালনা করে অথচ তাহাদের মস্তকের কলসী অটল থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরকে হৃদয়ে অটল রাখিয়া আহার, বিহার, শয়ন, বিশ্রাম ও সাংসারিক কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করিবে। ব্যবস্থানুসারে হিন্দুগণ প্রায় সকল অব-স্থায় ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া থাকেন; শয়নে পদ্মনাভ, ভোজনে জনার্দ্দন, সঙ্কটে মধুসূদন, সর্ব্বকার্য্যে মাধব এবং

স্নানে গঙ্গা, আচমনে বিষ্ণু, পাকে অন্নপূর্ণা, ধনার্জ্জনে লক্ষ্মী, অধ্যয়নে সরস্বতী প্রভৃতি নামে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া থাকেন, সুতরাং রমণীগণকে সেজন্য স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিতে হইবে না, কেবল মনের একাগ্রতা থাকিলেই চলিবে। ঈশ্বরারাধনার গৃহটী স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক, সেই ঘরটিতে কোন অপবিত্র দ্রব্যাদি রাখা কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মপুস্তক, সুগন্ধি কুসুম, চন্দন, ধুনা গুগ্গুল, অগ্নি, পবিত্র আসন ও দেওয়ালের গায়ে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা গণের প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কিছু রাখিবে না। সেই গৃহে হাস্য পরিহাস করিবে না ও শাস্ত্রালাপ ব্যতীত অন্য কথা বলিবে না। ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিবে এবং যতক্ষণ তথায় থাকিবে, কেবল ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরের গুণগান করিবে। যে বাটীতে ঈশ্বরের পবিত্র ও অমৃতময় নাম কীর্ত্তিত না হয়, সে বাড়ী মরুভূমি বা শ্মশান।

পারিবারিক সুখ সাধন ও অতিথি সেবাই গার্হস্থ্যধর্ম্মের মূল। বহু পরিবার একান্নে থাকিয়া স্থানবিশেষে যে আমরা অশান্তি দেখিতে পাই সে কেবল গৃহিণীগণের স্বার্থপরতা, পরিশ্রম-কাতরতা ও ঈর্ষাপরায়ণতা দোষেই ঘটিয়া থাকে। এটী পূর্ব্বে এত অধিক ছিল না, তাহা চিন্তা ও অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, কেননা পূর্ব্বে হিন্দু পরিবারে ইংরেজ অনুকরণ প্রবেশ করে নাই। এখন ইংরেজ অনুকরণের গুণের ভাগ আত্ম-নির্ভর, কর্ম্মশীলতা প্রভৃতি আসুক না আসুক, বিলাসিতা ও সৌখিনতার অংশ টুকু পূর্ণ মাত্রায় হিন্দু পরিবারে বিরাজ করায় অনেক গৃহিণী আর এখন একান্নে বহু পরিবার মিলিত হইয়া থাকিতে চাহেন না। যদিও বহু পরিবার একান্নে থাকার দোষ গুণ আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তবুও এই টুকু না বলিয়া থাকা যায় না যে বহু পরিবারবেষ্টিত ও একান্নভুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুকালে আপন স্ত্রী পুত্র কন্যাগণের জাতি ও মানরক্ষা এবং প্রতিপালনের ভাবনা ভাবিয়া যাইতে হয় না। যাহাহউক একান্নবর্ত্তিতা যেন রমণীর দোষে পলায়ন না করে। কেননা হিন্দুরমণীর গার্হস্থ্যধর্ম্ম—গুরুজনের শুশ্রূষা, ননন্দা ও যাতৃগণের প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করা, দেবরগণের প্রতি ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করা, ভ্রাতা ভগিনীর হিতকামনা করা ও সংসারস্থ লোকগণ যাহাতে সুখে থাকেন কায়মনোযত্নে তাহার অনুষ্ঠান করা। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার মহাভারত নামক গ্রন্থের নারীধর্ম্মে বলিয়াছেন—

"শ্বশ্রূ শ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তী গুণান্বিতা।
পিতৃমাতৃপরা নিত্যং যা নারী সা তপোধনা॥"

এখন অনেক স্থলেই বিশেষতঃ ধনিকন্যা পুত্রবধূকে পুত্রের মনস্তোষার্থে—বিলাসিনী বধূর বিলাস-বাসনা চরিতার্থ জন্য শাশুড়ীকেই বধূর শুশ্রূষা

করিতে হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় মহর্ষি ব্যাসদেব এখন জীবিত নাই, থাকিলে "শ্বশ্রূ শ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তী" স্থলে বধ্বাঃ পাদৌ তোষয়ন্তী, বসাইয়া দিতেন যদি বধূর অকল্যাণ হওয়ার আশঙ্কা হইত, তাহা হইলে নয় "পাদৌ" স্থলে "হস্তৌ" দিলেই চলিতে পারিত। সে যাহা হউক অতিথিকেও যতনে আহারাদি প্রদান করা রমণীর কর্ত্তব্য, অতিথি শত্রু হউক, মিত্র হউক, হীন জাতি হউক অথবা যে অবস্থাপন্ন হউক, গৃহে আসিলেই মনে করিতে হইবে—

"সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ"।

সন্তান-পালন রমণীর একটী গুরুতর কার্য্য। শুধু স্নান, পান, আহার, বেশ-ভূষা করাইয়া 'বাবা,যাদু, গোপাল' বলিয়া আদর করিলে পালন করা হয় না, ধাত্রীকরে সমর্পণ করিলেও সে কর্ত্তব্যের শেষ হইল না। অশিক্ষিতা, অসদ্বংশজা বেতনভোগিনী ধাত্রী-করে কদাচ সন্তানকে প্রদান করিবে না, সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখিবে, সুনীতি দ্বারা সন্তানের চরিত্র গঠন করিবে, অসভ্য ও অসচ্চরিত্র লোক হইতে সন্তানকে দূরে রাখিবে, শিশুর নিকট মিথ্যা কথা বলিবে না ও অন্যায় কার্য্য করিবে না। সন্তানকে শুধু খাওয়াইয়া শোওয়াইয়া আদুরে গোপাল করিয়া তুলিলে চলিবে না, যাহাতে শিশু শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহার অঙ্কুর শিশুর কোমল হৃদয়ে উপ্ত করিয়া দিবেন, তাহা হইলে শিশু ভবিষ্যতে সমাজের ও জগতের কার্য্যে আসিবে এবং বাঙ্গালী-গণের মধ্যে "আদর্শ মাতা নাই" এই কলঙ্কও ঘুচিয়া যাইবে। শিশুর হৃদয়ে কুসংস্কার যাহাতে স্থান না পায় তাহার চেষ্টা করিবে, শিশুর সৎসাহসে উৎসাহ দিবে, ক্রীড়া কুর্দ্দনে বাধা দিবে না, তবে যাহাতে আঘাত প্রাপ্ত না হয় অবশ্যই সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে—এক কথায় সন্তানটীকে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র করাই জননীর কর্ত্তব্য, তাহা নহিলে আর মনুষ্য-জননীর গৌরব কি? পশু পক্ষীরাও ত সন্তান প্রসব করিয়া বাঁচা-ইয়া রাখে, কিন্তু পশু পক্ষি-জননী অপেক্ষা মনুষ্য-জননীর দায়িত্ব গুরুতর এই কথা স্মরণ করিয়া রাখা মনুষ্য জননীর কর্ত্তব্য, কেননা সমাজের আশা ভরসা ও উন্নতি তাঁহাদের করে ন্যস্ত। অতএব সন্তানকে বাধ্যতা, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, ন্যায়পরায়ণতা ও কর্ত্তব্যে অটলতা শিক্ষা দিবেন ও অন্যায়, দুষ্কর্ম্ম এবং প্রলোভনহইতে দূরে রাখিবেন, পাপ কার্য্যে ঘৃণা ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মাইয়া দিবেন। জননী শিশুর প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করিবেন। কর্কশ ব্যবহারে শিশুগণ বাধ্য না হইয়া অবাধ্য হইয়া উঠে। শিশুকে শাসন করিতে হইলে দুমদাম করিয়া প্রহার না করিয়া বা যমের বাড়ী যাইতে আদেশ না দিয়া তাহার প্রিয়বস্তু হইতে একদিনের জন্য

বঞ্চিত করিলে সে বিলক্ষণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। শিশুকে কোন দ্রব্য দিতে চাহিয়া পরে তাহা না দেওয়া অন্যায়, কারণ উহাতে তাহাকে প্রতরণা শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুগণ স্বইচ্ছায় যাহা খায় তাহা ব্যতীত জুজুর ভয় দেখাইয়া খাওয়ান অন্যায়। শিশুগণ যাহাতে উদ্যমশীল ও শ্রমশীল হয় তাহা করা কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। নূতন বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' হইয়াছেনঃ—বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং বাবু দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। তিনজনই সুবিদ্বান্‌ ও সুযোগ্য।

২। গত ২৮এ ডিসেম্বর প্রাতে কলিকাতার বেলেঘাটা প্রাসাদে মহীশুরের মহারাজা সার রাজেন্দ্র উদিয়ার বাহাদুরের মৃত্যু হয়। ইনি বিধবারাণী এবং ২ পুত্র ও ৩ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। সদাশয়া রাণী এই উপলক্ষে ১০ হাজার ভিক্ষুককে এক একখানি কম্বল বিতরণ করিয়া সদল স্বদেশ গমন করিয়াছেন।

৩। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মুসলমান বালিকা এফ এ পরীক্ষা দিয়াছেন। ইঁহার নাম কুমারী বেলগ্রামি। ইহা মুসলমান স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির প্রমাণ।

৪। জাতীয় মহাসমিতি উপলক্ষে মান্দ্রাজে সামাজিক সভার ৮ম বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে সুব্রহ্মণ্য আর্য্য সি আই ই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, সভায় কয়েকটী সৎপ্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে।

৫। সমাজ-সংস্কার প্রচারক বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বঙ্গদেশের নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া বহুবিবাহের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় বরিশালের কলসকাটীর ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অল্পদিন পরলোকগত, তিনি ১০৭টী বিবাহ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলায় ভাটকুল গ্রামের কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় জীবিত বহুবিবাহকারীদিগের শ্রেষ্ঠ, তাঁহার স্ত্রীসংখ্যা ৬৫টী। ২০ বৎসরের দুইটী ব্রাহ্মণ যুবক ১১টী ও ৭টী করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। আজিও দেশের কি দুর্দ্দশা!

৬। ভিয়েনা নগরে আডল্‌ফ শ্লেসিঙ্গার নামে এক ব্যক্তি সম্প্রতি ক্ষয়কাশ রোগে মারা গিয়াছে। তাহার হৃৎপিণ্ড বক্ষকোশের দক্ষিণ দিকে এবং প্লীহা, যকৃৎ ও নাড়ী সকলের সংস্থান উল্‌টা দিকে ছিল!

৭। বাইবেল ও কোরাণমতে মানবের আদিমাতা ইব। আরবের

জিড্ডা নগরে তাঁহার এক কবর আছে, প্রতি বৎসর ৪০ হাজারের অধিক যাত্রী তাহা দর্শন করিতে যায়।

৮। পশুশালায় ৯ ফিট দীর্ঘ একটী বরাচিতা সাপ ৭ ফিট দীর্ঘ এক সহচর সর্পকে উদরসাৎ করিয়াছে।

৯। সুরাজপুরের রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিং আরায় জলের কল স্থাপনার্থ দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

১০। মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ে ৩০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

১১। আফগানস্থানে বিবি হামিল্‌টন আমীরের অন্তঃপুরের ডাক্তার হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে একা এক ঘরে ৬ জন শান্ত্রি-বেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয়। কোনও সংবাদ পত্রাদিতে তাঁহার কিছু লিখিবার অধিকার নাই।

১২। হস্তী ৬০০ হস্ত দূর হইতে মানবের আঘ্রাণ বুঝিতে পারে।

বামারচনা।

শীতকালের পত্র।

শ্রীমতী নঃ——

১

কি লিখিব বিধুমুখি,
তব সুখে আমি সুখী,
জানিছ তা' চির দিন কি কাজ কথায়,
তবে কি না পৌষ মাস,
তাহাতে পশ্চিমে বাস,
এত শীতে চিটি ফিটি লেখা বড় দায়!
আমার মুখের কথা,
কি লিখিব স্নেহলতা,
দারুণ পাহা'ড়ে শীতে ফেটে গেল কায়;
জানিতেছ অতঃপর,
অগাউন কলেবর,
পায়ে নাই বুট মোজা, ক্যাপ না মাথায়।
বিধি পাঠাইলা ভুলে,
বাঙ্গালি হিন্দুর কুলে—
পাথর লোহায় গ'ড়া যাহাদের নারী—
আমরা তো ননী-দলা—
কাজ নাই খুলে বলা—
মা' পিসী, ঠাকু'মা সম আমরা কি পারি?
পরম গুণের নিধি
শ্রীমতী বামুন দিদি
গরম গরম লুচি দিবেন রাঁধিয়া—
কপালে তা লেখা নাই,
তাই যেতে হয় ভাই,
নিঠুর রন্ধন-শালে "অম্বরা" স্মরিয়া।
যদি মোরে ভালবাস
ত্বরা তুমি হেথা এস,
তোমা বিনা এত শীতে টি'কেনা পরাণ;
এ বাহুতে তুমি শক্তি,
এ হৃদয়ে তুমি ভক্তি,
এ শীতে তুমিই মম শাল আলোয়ান!
এস চলি সুবদনে,
লেপ গায়ে দুইজনে,
খুলি হৃদি খুলি মুখ জাগি সারা রাতি,
ছারপোকা ভরি প্রাণ
শোণিত করিয়া পান,
আমাদের "মহত্বের" করুক সুখ্যাতি!

২

আমি তাই ভাবি নিত্য,
কি সুখ ভ্রমিতে তীর্থ,
তুমি ভাই, চলে গেলে হরিদ্বার কাশী ?
কি বলিব কি যে দুঃখ,
তুমিও হ'লে কি মূর্খ ?—
কোটী তীর্থফল পেতে এখানে যে আসি !
ঘোমটায় মুখ ঢেকে,
(চাঁদেতে নীরদ মেখে !)
এখানে হ'তনা সদা লুকাতে অন্দরে,
ফিরিতাম দুই জনে
শৈলে শৈলে বনে বনে,
নিঝরে, তটিনী-তটে, নীরব কন্দরে !
হা ধিক্ তোমার চিত্তে,
এর চেয়ে কোন্ তীর্থে
আশার সুসার কিবা, কিবা পুণ্য মিলে ?
অনিত্য জগত ভাই,
সুখহীন সর্ব্ব ঠাঁই,
কি হইবে রেলওয়ে ভ্রমিতে লাগিলে ?
নিত্য সুখ চিরতরে
এখানে বিরাজ করে,
দোলে মানবের পিঠে যশ-পুণ্য-ছালা,
অদৃষ্টে সৌভাগ্য কোটে,
নিত্য দুপহরে জোটে
খিচুড়ী পায়সে ভরা খাগড়াই থালা !
বেশী কথা কাজ নাই
"পয়সা" অনিত্য ভাই—
"রিটার্ণ টিকেট" খানি ছিঁড়ে ফেলে দাও,
কাব্য রস, গব্য রস,
দেহে পুষ্টি, নামে যশ,
আইস !—এসব সুখ ভোগ করে যাও।

৩

শুনিলাম এই মাসে
যাবে তুমি পতি-পাশে,
করিতে গৃহিণীপনা—ধিক্ মূর্খতায়—
এত শীতে নারী কেবা,
করে পতি-পদ-সেবা,
পৌষ মাসে ঘরকন্না কে করিতে চায় ?
শাস্ত্রের বচন সতি !
শীত কালে যার পতি
রাঁধেন বাড়েন নিজে প্রফুল্ল অন্তরে,
"সেই ধন্যা নারীকুলে,
লোকে তারে নাহি ভুলে"
চির-সোহাগিনী জায়া শিবদুর্গা-বরে !
ছুতো পেলে মুখ নাড়া—
মনে মনে "লক্ষ্মী ছাড়া"
সে অনিত্য আবদার দূর করি দাও,
ত্বরা করি এস চলে,
আমারি লেপের তলে,
কিছুদিন নিত্য সুখ ভোগ করে যাও।
পত্র পাঠ মাত্র, রাণি,
নিয়ে এস মুখখানি,
অধরে সে হাসি এন, নয়নে সে দিটি,
কথা এন মিঠে কড়া,
(অভিমানে সুর চড়া)
আঁচলে বাঁধিয়া এন সে ক'খানি চিটি।
এ শীতে পাহা'ড়ে দেশে,
একেলা নিরীহ বেশে,
নিতান্ত নীরব হ'য়ে থাকা বড় দায়—
তাই পত্র ডাকে দিয়ে,
পথ-চাওয়া আঁখি নিয়ে,
রহিলাম লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায়।

তোমারই
মেজদিদি।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৭১ সংখ্যা | মাঘ ১৩০১—ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কুমারী মূলার—ইনি বিলাতের (Purity Society) পবিত্রতা সংরক্ষণী সভার সম্পাদিকা এবং এক ধনাঢ্যা রমণী। ভারতের প্রতি তাঁহার এতদূর অনুরাগ যে অক্ষয়কুমার ঘোষ নামক এক হিন্দু বালককে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার বারিষ্টারী শিক্ষার ব্যয় দিতেছেন। ইনি নিরামিষ ভোজন করেন এবং অনেক বিষয়ে হিন্দু-ভাবের পক্ষপাতিনী। মান্দ্রাজ কনগ্রেস দেখিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন।

মূক-বধির বিদ্যালয়ে আশ্চর্য্য দান—খিদিরপুরবাসিনী শ্রীমতী কামিনী দাসী সুবর্ণবণিক্‌জাতীয়া এক বিধবা রমণী। তাঁহার স্বামী তেজারতী করিয়া কিছু টাকা সঞ্চয় করেন এবং মৃত্যুকালে সৎ-কার্য্যে অর্থ দান করিবার আদেশ করিয়া যান। পতিব্রতা রমণী "কালা বোবারা অতি দয়ার পাত্র" বুঝিয়া তাহাদের জন্য ৬১৮০ টাকা দান করিয়াছেন। ইহাদ্বারা কোম্পানীর কাগজ ক্রীত হইয়া মূক-বধির বিদ্যালয়ের ট্রষ্টীদিগের হস্তে থাকিবে। আমরা আশা করি এই দানে বিদ্যালয়ের স্থায়ী ফণ্ডের সূত্রপাত হইল। অন্যান্য দয়াশীল পুরুষরমণীগণ এই সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া এই ফণ্ডের উন্নতিবিধান করুন।

দান—মহীশূরের মহারাণী শোভা-বাজার দাতব্য সভায় ৪০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বোম্বাই সহরের দুর্গ মধ্যে এক পুস্তকালয়ের গৃহনির্ম্মাণার্থে তিন লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

চীন জাপানী যুদ্ধ—হাইফন নামক স্থানে আবার এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়,

জিহাতে চীনেরা পরাস্ত ও তাহাদের ২০০ সৈন্য হত হইয়াছে। জয়ী জাপানীরা চিঙ্ অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। চীন সৈন্যদল তাহাদের ভয়ে সুবিখ্যাত বৃহৎ প্রাচীরের নিম্নে আশ্রয় লইয়াছে। শীত ও বরফপাত হেতু জাপানীরা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে পারিতেছে ন।

ভারতেশ্বরীর সৌজন্য—বোম্বাইয়ের ফতেহালি সেথ মহম্মদের দুহিতা আলি আকবর বিবি সাহের উইণ্ডসার প্রাসাদে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বহস্ত নির্ম্মিত কয়েকটী জরীর পাড় উপহার দেন। মহারাণী অতি সমাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ বিবীর এক পুস্তকে স্বহস্তে [illegible]নার নাম লিখিয়া দিয়াছেন।

নগর ভাঙ্গা গড়া—দিল্লী হিরা-নগর অনেকবার ভাঙ্গিয়া নূতন নূতন স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু হিরাটের ন্যায় ধ্বংসশীল নগর আর নাই। ইহা ৫৬ বার ধ্বংস হইয়া ৫৬ বার নূতন গঠিত হইয়াছে।

রুক্মা বাই—বিলাতে এম ডি পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন ও চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন।

অতিকায় রমণী—রেঙ্গুণে এক স্থূলকায় মগ যুবতী প্রদর্শিত হইতেছে। ইহার বয়স ২১ বৎসর মাত্র, ইতিমধ্যে দেহের উচ্চতা ৭ ফুট অতিক্রম করিয়াছে।

বারমেসে।

ফাল্গুন।

ফাল্গুন পূরা বসন্ত কাল। এই কালে মৃত্তিকায় নব রসের সঞ্চার হইয়া থাকে। এই জন্য এমাসে চাসবাসের অনেক কথা আছে। আমরা অতি সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিব।

পান,—যাহারা পানের চাস করে, তাহাদিগকে বারজি বারুই কহে। বারজি নবশাখ জাতির অন্তর্গত, জলাচরনীয়। পানের চাসে যেরূপ লাভের কথা শুনা যায়, তাহাতে এক বিঘা জমিতে পানের চাস করিতে পারিলে, পল্লীগ্রামের একটী ক্ষুদ্র গৃহস্থের সংসার চলিয়া যায়। পান চাসের জমা খরচ ঠিক করা বড় সহজ নহে; কিন্তু শুনিতে পাই, খরচ বাদে এক বিঘা জমির পানে বাৎসরিক ১৫০৲ দেড় শত টাকা লাভ হইতে পারে।

যেখানে বেশি রৌদ্র পায় না, প্রায়ই ছায়া থাকে, তাদৃশ দোআঁশ মাটীর ভূমিকে ন্যুব্জপৃষ্ঠ অর্থাৎ কাছিম পিঠে করিয়া তাহাতে পানের চাস করিতে হয়; কারণ পানের গোড়ায় বর্ষার জল লাগিলে অনিষ্ট হয়। এই জন্য ভূমিকে

কাছিম পিঠে করিতে হয় এবং বৃষ্টির জল সহজে নির্গত হইতে পারে, এজন্য ঐ ভূমির মধ্যে মধ্যে নালা কাটিতে হয়। ঐ নালার উভয় পার্শ্বে দাঁড়া বাঁধিয়া ফাল্গুন মাসে পান লতার গোড়া, বা ডগা রোপণ করিয়া তাহা তৃণপত্রাদিদ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক তদুপরি জল সেচন করিতে হয়। ঐ তৃণাদি সর্ব্বদা জলসিক্ত থাকা আবশ্যক। পরে উপরে ও চারি-পাশে শর, খড়ি, বা পাকাটির মাচা ও বেড়া বাঁধিয়া দিবে এবং প্রত্যেক দাঁড়ার পার্শ্বে শর বা খড়ির জাফরি বাঁধিয়া দিবে। ভূমির মধ্যে মধ্যে জিয়ল, জীবন, জয়ন্তী প্রভৃতি বহুপত্রযুক্ত জীবিত বৃক্ষ সকল রোপণ করিতে হয়, তাহাতে পানের ভূমিতে ছায়া হয়। ছায়ায় পান ভাল থাকে। প্রত্যেক পানের মূলে এক একটী সর, খড়ি, বা পাকাটি দিয়া পার্শ্বের বেড়া ও মধ্যের জাফ্রির সহিত যোগ করিয়া দিতে হয়। তাহাতে পানের লতা সকল ঐ শরাদির আশ্রয়ে মাচায় উঠে। ভূমি পরিষ্কার রাখা, মধ্যে জল সেচা এবং পানের লতা সকলকে টানিয়া ও গোছাইয়া দেওয়াই পানের প্রধান পাইট। পাকা পানই ব্যবহার যোগ্য, এজন্য লতার গোড়ার দিক হইতে পান ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিতে হয়। পানের ক্ষেত্রে অধিক চাস দিতে হয় না। যথা—

"ষোল চাসে মূলা,
তার অর্দ্ধেক তুলা;
তার অর্দ্ধেক ধান,
বিনা চাসে পান।" খনা।

আড়াই বৎসরের কমে পানলতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। প্রথম ফাল্গুন বা চৈত্রে রোপণ করিতে হইবে, তাহার পর তিন শ্রাবণ অতীত হওয়া আবশ্যক। যথা,—

"এক আমনে ধান;
তিন শাওনে পান।" খনা।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে অতিরিক্ত পান জন্মে, সে পান খাইলে পিত্তবৃদ্ধি হয়; এজন্য তাহা খাওয়া নিষিদ্ধ।

ধান,—যদি বর্ষার গতিকে এমন ঘটনা হয় যে, ফাল্গুন মাসের পূর্ব্বে হৈমন্তিক ধান্যচ্ছেদ করা যায় না, ফাল্গুনেই তাহা করিতে হয়, তাহা হইলে সে ধানে কিছুই হয় না। যথা,—

"——ফাল্গুনে ফাঁড়া।" ফাঁড়া অর্থাৎ ধান্যে মহা বিঘ্ন।

তিল,—ফাল্গুনের শেষ আট দিন এবং চৈত্রের শেষ আট দিন, ইহার মধ্যে তিল বপন করিলে সেই তিলগাছ উত্তমরূপ সতেজ হয়। যথা,—

"ফাল্গুনের আট, চৈত্রের আট;
সেই তিল দায়ে কাট।" খনা।

কলা,—ফাল্গুন মাসে কলাগাছের এঁটে কাটিয়া রোপণ করিলে কলার ঝাড় খুব বড় হয় এবং সেই ঝাড়ে অধিক কলা ফলে। যথা,—

"ফাল্গুনে এঁটে পোঁত কেটে;
বেধে যাবে ঝাড়কি ঝাড়।
কলা বইতে ভাঙ্গবে ঘাড়।" খনা।

ফাল্গুন মাসে কলার আবাদ করিলে ঝাড় এত উত্তম হয় যে, সেই ঝাড়ে মাঝে মাঝে কলা ফলে। যথা,

"যদি রোয় ফাল্গুনে কলা ;
তবে হয় মাস কমলা।" খনা।

পটল,—এই মাস পটল রোপণের প্রশস্ত সময়। পটলের মূল সকল উত্তম-রূপে কর্ষিত ভূমিতে প্রতি থানায় ৩।৪টী হিসাবে রোপণ করিতে হয়। রোপিত মূলগুলির উপর শুষ্ক আচ্ছাদন করিতে হয়। ঐ পরিচালক তৃণে শিশির সঞ্চিত হইয়া সত্বর অঙ্কুরোদ্গমের সহায়তা করে।

"পটল বুনলে ফাগুনে ;
ফল বাড়ে দ্বিগুণে। খনা।

ওল,—ওলের প্রথম আবাদও এই মাসে করিতে হয়। এই মাসে ওলের আবাদ না করিলে ওল ভাল হয় না। ওল উৎকৃষ্ট তরকারী। এইমাসে বিশেষ যত্নসহকারে ওলের আবাদ করা উচিত।

"ফাগুনে না রুলে ওল ;
শেষে হয় গণ্ড গোল।" খনা।

যে স্থানে উত্তমরূপে রৌদ্র লাগে না, সর্ব্বদা ছায়া থাকে, সেখানে ওলের আবাদ করা উচিত নহে ; কারণ তথাকার ওলে মুখ ধরে ; কিন্তু তত্রত্য ওল বেশ বড় বড় হয়।

"ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ,
কিন্তু তাতে নাহিক দুখ।" খনা।

বাঁশ,—এই মাসে বাঁশঝাড়ের গোড়ায় আগুন দিতে হয়। শরতের প্রারম্ভ হইতেই বৃক্ষাদির পত্র স্খলন আরম্ভ হয়। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত তরুলতাদির প্রায় সমস্ত পত্র পতিত হইয়া যায়। এই মাসে বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায় যত শুষ্ক পাতা পতিত থাকে, তাহা মূলদেশের চতুঃপার্শ্বে রাশীকৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি দিতে হয়। ঐ অগ্নিদ্বারা গোড়ায় সমস্ত বাঁশপাতা পুড়িয়া ছাই হয় এবং চৈত্রমাসে ঐ ছাই-য়ের উপর মাটী চাপা দিতে হয়। এই মাটী পলল হইলে বড় ভাল হয়। ঐ বাঁশপাতা পোড়া সার এবং মাটী পর-বর্ত্তী বর্ষা নাবিতে গলিত ও মিলিত হইয়া বাঁশঝাড়ের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করে। এই শ্রীবৃদ্ধি অতি সত্বর হয়। এই সঙ্গে বাঁশঝাড়ের আরও একটী নিয়ম জানা উচিত। যখন ঝাড় হইতে বাঁশ কাটিবার প্রয়োজন হইবে, তখন তিন বৎসরের ন্যূন-বয়স্ক বাঁশ কাটা হইবে না।

"ফাল্গুনে আগুন চৈতে মাটী ;
বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি। অথবা
বাঁশ ছেড়ে বাঁশের পিতামহ কাটী।"

মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায়, সন্তানের মুক্তি।

(৩৬০ সংখ্যা ২৬৬ পৃষ্ঠার পর)

শেষ।

এ জগতে যিনি মাতৃ-ভক্ত ও মাতৃ-উপাসক, তিনিই দেবতুল্য, তিনিই নর দেবত। ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের মাতৃ-ভক্তি, আদর্শ মাতৃ-ভক্তি। চৈতন্য দেব সন্ন্যাসী হইয়াও মা'কে দেখিতে আসিয়াছিলেন, ভিক্ষালব্ধ বস্ত্রখানি

মা'কে দিয়াছিলেন, মা'র আজ্ঞায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অন্বেষণ ও নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। মহাত্মা যীশু খ্রীষ্ট শত্রুর চাতুরীতে যখন ক্রুশে নিহত হন, তখন পার্থিব ভাবনার মধ্যে কেবল মা'র ভাবনাই ভাবিয়াছিলেন, পার্থিব কাজের মধ্যে কেবল মা'কেই শিষ্যের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন (১)। যে রাজা রাম মোহন রায় ধর্ম্মবিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা ও মহাপ্রাণতার আদর্শস্বরূপ, তিনি এমনই মাতৃ-ভক্ত ছিলেন যে মাতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য (নিরাকার ঈশ্বরবাদী হইয়াও) ইজার চাপকান খুলিয়া, গোময়ে চরণ স্পর্শ করিয়া হিন্দু-দেবালয়ের সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন (২)। যে কেশব চন্দ্র সেন দেশে বিদেশে "মহাপুরুষ" বলিয়া কীর্ত্তিমান্, সেই কেশব চন্দ্র সেন এমনই মাতৃভক্ত, যে মৃত্যু-কালে মায়ের পদধূলি মাথায় দিয়া বলিয়াছিলেন "মা! তোমার গুণগুলি পাইয়াই আমি মানুষ হইয়াছিলাম—তোমার মত মা যেন সকলেরই হয়"! যে অক্ষয় কুমার দত্ত বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন, যাঁহার মহত্ত্ব শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়, সেই অক্ষয় কুমার এমনই মাতৃভক্ত যে প্রাণের উচ্ছ্বাসে বলিয়াছেন—

"প্রত্যক্ষ-দেবত-মাতুশ্চরণং কমলায়তে।
অঙ্গুল্যশ্চ দলায়ন্তে মনো মে ভ্রমরায়তে।" (৩)

যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা দেশ ধন্য করিয়া গিয়াছেন, যে বিদ্যাসাগরের গুণের খ্যাতি ভারতে "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" রহিবে, সেই বিদ্যাসাগর এমনই মাতৃ-ভক্ত যে সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া মাতৃ-দর্শনে গিয়াছিলেন এবং বহুদিনগতা জননীকে মনে হইলেই বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিতেন! এ সংসারে যে কেহ প্রকৃত মাতৃ-ভক্ত, মাতৃ-উপাসক, তিনি বিনীত, নিরহঙ্কারী, কৃতজ্ঞ, সহৃদয় ও নরদেবতা। সকলেই যে বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মত যশস্বী হইতে পারেন না একথা সত্য, কিন্তু মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতে সন্তান যে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, একথা আরও সত্য।

যে সন্তান মাতার নিকটে অকৃতজ্ঞ, সে মানব-কুলকলঙ্ক। সে জ্ঞানীই হউক, ধনীই, যত বড় ক্ষমতাপন্নই হউক, বরং মাতৃভক্ত দীন, মূর্খের পদ-ধূলি লইব, তথাপি সে অকৃতজ্ঞ সন্তানের ছায়াও স্পর্শ করিব না! তাহার হৃদয়ও নাই, তাহাতে মনুষ্যত্বও নাই!—বড় দুঃখের কথা, বড় ক্ষোভের কথা আজি কালি আমাদের দেশে অকৃতজ্ঞতার কিছু

(১) যোহন লিখিত সুসমাচার দেখ।

(২) রাজা রামমোহন রায়ের উক্ত কার্য্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিত ও "সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত।

(৩) শ্রদ্ধেয় অক্ষয় বাবুর কবিতার অর্থ এই যে "প্রত্যক্ষ-দেবতা-মাতার চরণপদ্ম, অঙ্গুলিগুলি সেই পদ্মের দল এবং আমার মন তাহাতে ভ্রমর হইয়া আছে।"

বাড়াবাড়ি হইয়াছে! মা'যে সন্তানের "সাক্ষাৎ ঈশ্বরী" একথা অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন; কারণ ভারতবর্ষের দুরদৃষ্ট ক্রমে অনেক ভারত-সন্তান বিচারশক্তি হীন হইয়া পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতেছেন! ভারতীয় নীতির অনেক গুলি যে আদর্শ নীতি, ইহা তাঁহারা বোঝেন না! তবে যাহা ভাল তাহা বিদেশের হইলেও গ্রহণীয়, যাহা মন্দ তাহা দেশের চিরন্তন প্রথা হইলেও ত্যাজ্য—কিন্তু আজিকার দিনে সে হিসাব দূর হইয়াছে—যাহা ইংরাজে বলে, ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাহাই ভারতবাসীর শিরোধার্য্য। যাহা ইংরাজে করে, সঙ্গত হউক আর অসঙ্গত হউক, তাহাই ভারতবাসীর "অবশ্য কর্ত্তব্য"। ইংরাজের পদানুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেই ভারতবাসীর জীবন সার্থক হয়! এসব কাজ রাজভক্তি-মুলক নহে, মহত্ত্বের ভক্তিমূলকও নহে—অন্ধ ভক্তি মাত্র! অন্ধ ভক্তি প্রণোদিত হইয়াই ভারতবাসী সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছেন, গুণ ছাড়িয়া দোষ অনুকরণীয় হইতেছে, ভাল ছাড়িয়া মন্দ টানিয়া আনিতেছেন? এদিকে স্বদেশের জীবন্ত নীতি, অমূল্য রত্নাবলী, ছাই চাপা পড়িয়া মারা যাইতেছে!—এই এদেশে মাতৃ-ভক্তি বিষয়ক অমূল্য উপদেশ, উজ্জ্বল আদর্শ সকল থাকিতে, পাশ্চাত্যে নেপো-লিয়ান বোনাপার্টি, ডিউক অব্ ওয়েলিং-টন, জর্জ্জ ওয়াসিংটন, ম্যাট্‌সিনি, সামুয়েল রোমেলি প্রভৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকিতে, এদেশী:য়রা সাধারণ সাহেব, নগণ্য সাহেব, চুণাগলির পচা সাহেব-দিগকে "আদর্শ" স্বরূপ মনে করিতে-ছেন! মাতৃ-ভক্তি দূরে যাউক, এই রকম সাহেবেরা মাতার ভরণ পোষণ যে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাও বোঝেন না! ইহাদিগের পদাঙ্ক লক্ষ্যকারী অনেক দেশীয় "কৃতীসন্তান"ও সেই আদর্শ গ্রহন করিতে উদ্যত হইয়া-ছেন!—ইহারা কেহ কেহ মাতাকে "Dear mother" বলিয়া "অনুগ্রহ" করেন, কেহ কেহ "বুড়া মাগী"কে ভক্তি ও যত্নাদি করা ভারি "অসভ্যতা" মনে করেন!! ভারতবর্ষ যত কারণে অধঃ-পতিত হইতেছে, সন্তানের মাতৃভক্তির হীনতা তন্মধ্যে এক প্রধান কারণ। মাতৃ-ভক্তির হীনতায় মানবের হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইতেছে; সহৃদয়তা, নিরহঙ্কারিতা দূর হইতেছে; আত্মারসদ্গুণ সকলও বিলুপ্ত হইতেছে!! যে ব্যক্তি মাতার নিকটে অকৃতজ্ঞ, সেইই প্রকৃত কৃতঘ্ন! যেখানে কৃতঘ্নের বাস, সেস্থান শ্মশান হইতেও ভয়ানক। কৃতঘ্ন ব্যক্তি নরপিশাচ সদৃশ—হিন্দু শাস্ত্রে কৃতঘ্নতাকে পাপের "শেষ সীমা" বলা হইয়াছে, সংস্কৃতে আছে—

"ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতি র্বিহিতা রাজন্ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥"

প্রকৃত পক্ষে কৃতঘ্নতা যে মহা পাতক, একথা ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে

পারেন।—এবং সেই সঙ্গে মাতৃ-ভক্তি লাভ যে সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাও বুঝিতে পারেন। যেদিন এদেশের ছোট বড়, বালক বৃদ্ধ, মুর্খ পণ্ডিত, স্ত্রী পুরুষ সকলেই মাতৃ-ভক্ত হইবেন, মাতৃ-ভক্তির পূর্ণ বিকাস করিতে পারিবেন, এ পতিত দেশ সেই দিনেই উঠিবে, সেই দিনেই মানবের—এ দেশীয় মানবের "জাতীয় উত্থান" ঘটিবে!

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতীয় অনেক নীতি জগতের আদর্শ নীতি। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতায় এক দিন ভারতীয় আর্য্যজাতি পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ ছিল। তাঁহাদের মাতৃ-ভক্তির প্রবলতায়ও সকলকে মুগ্ধ হইতে হয়; তাঁহাদেরই নিকটে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" ছিল। তাঁহারা জানিতেন

"যদ্‌গর্ভে জায়তে লোকো যস্যাঃ স্নেহেন জীবতি।
সা সাক্ষাদীশ্বরী মাতা কোঽস্তি মাতৃসমো গুরুঃ॥"

মাতাকে সম্মাননা, মাতৃ-সেবা, মাতৃ-আজ্ঞা পালন, মাতৃ-প্রিয়কার্য্য সাধন, মাতাকে সামান্য মানবী না ভাবিয়া পরম দেবতা মনে করা, এই সকল মাতৃ-উপাসনা তাঁহারা সন্তানের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য মনে করিতেন। আবার মাতা পরলোক গামিনী হইলে সন্তান পাছে মাতৃ-ভক্তি চ্যুত হইয়া পড়েন সেই ভয়ে তাঁহারা পরলোকগতা মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, বার্ষিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। এই কাজগুলি মাতার উদ্দেশে সন্তানকেই করিতে হয়; এই কাজগুলি যে মাতৃ-উপাসনা ভক্তিবৃত্তির স্ফুরণ ও ভক্তি-বৃত্তি চরিতার্থ করা যে এই কাজগুলির উদ্দেশ্য, ইহা বোধ হয় ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী সন্তান-গণ সকলেই বুঝিতে পারেন। ইহার মধ্যে গয়াধামের "মাতৃ-ষোড়শী" ভক্তিবৃত্তি স্ফুরণের একটী উৎকৃষ্ট উপায়। গয়াক্ষেত্রে গদাধরের পাদপদ্মের অতি নিকটে মাতৃ-ষোড়শী বলিয়া একটী স্থান আছে। সেখানে মাতৃ শ্রাদ্ধার্থী সন্তানকে মাতার উদ্দেশে ষোড়শটী পিণ্ড দান করিতে হয়, এবং প্রত্যেক পিণ্ডদান সময়ে এক একটী মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, মন্ত্রগুলি মাতৃভক্তি-উদ্দীপনার এত সহায়, যে পড়িলে প্রত্যেক মানবের হৃদয় মাতৃ-ভক্তি-স্রোতে প্লাবিত হইয়া থাকে এবং মাতা যে সন্তানের প্রত্যক্ষ দেবতা তাহাও বোধগম্য হইতে থাকে। পাঠক পাঠিকা-দিগের অবগতির জন্য আমরা মাতৃষোড়-শীর(১) সংস্কৃত মন্ত্র ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম—

মাসি মাসি কৃত কষ্টং যাতনাং প্রসবেষু চ।
তস্যা নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্॥

গর্ভাবস্থায় যে মাতা (আমার জন্য) মাসে মাসে কষ্ট ও পরে প্রসবকালে যাতনা ভোগ করিয়াছেন, সেই সকল

(১) বহুদিন পূর্ব্বে মাতৃষোড়শী বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

গাত্রভঙ্গোভবেন্মাতুঃ স্বস্তিং নৈব প্রযচ্ছতি।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ২ ॥

গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদাই মাতার গা ভাঙ্গিত, কিছুতেই তৃপ্তি হইত না, সেই নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

পদভ্যাম্ সঞ্চায়তে মাতুর্দ্দুঃখৈকৈব সুদুস্তরম্।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৩ ॥

গর্ভাবস্থায় সন্তানের পদতাড়নার জন্য মাতার বিবিধ, দুস্তর ক্লেশ হইয়া থাকে তাহা নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

পূর্ণেচ দশমে মাসি মাতুরত্যন্ত দুষ্করম্।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৪ ॥

দশমাস পূর্ণ হইলে মাতার যে দারুণ গর্ভযন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

গর্ভাদবগমে চৈব বিষমে ভূমি বর্ত্মনি।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৫

গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে মাতার যে বিষম কষ্ট হইয়াছে, তাহার নিষ্কৃতির (অর্থাৎ প্রতিশোধ) জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

শৈথিল্যাং প্রসবে চৈব মাতুরত্যন্তদুঃসহম্।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৬

প্রসবের বিলম্ব হওয়াতে মাতার যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ জন্য আমি এই মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

অগ্নিনা শোষণে দেহো ত্রিরাত্রানশনেষু চ।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৭

অগ্নিদ্বারা সেঁক তাপে এবং তিন রাত্রি অনাহারে (প্রসবান্তে) মাতার দেহ শুষ্ক হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

সেবেত কটুদ্রব্যানি দুঃখানি বিবিধানি চ।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৮

নানাবিধ কটু দ্রব্য ভক্ষণে মাতার নানাপ্রকার ক্লেশ হইয়াছে,* তাহার প্রতিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

দুর্লভানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং ত্যাগে বিন্দতি যৎফলম্।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৯

সুভক্ষ্য পদার্থ সকল ত্যাগ করিয়া মাতার যে দুঃখলাভ হইয়াছে, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটম্।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১০

রাত্রিকালে সন্তানের মল মূত্র দ্বারা মাতার পরিধেয় জীর্ণ বাস ছিঁড়িয়া যাওয়াতে মাতার যে ক্লেশ হইয়াছে, তাহা পরিশোধ জন্য মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

পুত্রে ব্যাধিসমাযুক্তে মাতৃদুঃখমহর্নিশম্।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১১

পুত্রের পীড়া হইলে দিবারাত্রি মাতার যে দুঃখ হয়, তাহা পরিশোধের জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

যদা পুত্রো ন লভতে তস্য মাতুশ্চ শোচনম্।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১২

পুত্র আহার না পাইলে মা যে

* এদেশে প্রসবান্তে প্রসূতিদিগকে, ঝাল, পাঁচন প্রভৃতি খাইতে হয়।

শোকাকুলা হন, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

ক্ষুধয়া বিহ্বলে পুত্রে দদাতি নির্ভরস্তনম্।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১৩

ক্ষুধায় বিহ্বল পুত্রকে মাতা যে বহুল পরিমাণে স্তন-দুগ্ধ পান করাইয়া থাকেন, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

দিবারাত্রৌ সদা মাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১৪

স্তনপান করাইতে দিবারাত্রি মাতার শরীর শোষণ হইতে থাকে, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

অল্পাহারবতী মাতা যাবৎ পুত্রোঽস্তি বালকঃ।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১৫

শিশু পুত্রের স্বাস্থ্যের জন্য মাতাকে অল্পাহার করিতে হয়, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

যমদ্বারে মহাঘোরে পথি মাতুশ্চ শোচনম্।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১৬

পাছে সন্তানের বিপদ বা মৃত্যু হয় এইজন্য মাতা (দিবানিশি) শোকাকুলা হইয়া থাকেন, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

ইহাই হিন্দু আর্য্যগণের মাতৃ-ষোড়শী। ভক্তির কার্য্য উপাসনা এ কথা আমরা আগে বলিয়াছি। উপাসনার আর এক উদ্দেশ্য এই যে উপাসনাদ্বারা ভক্তিবৃত্তি সম্পূর্ণতা লাভ করে। হিন্দুর মাতৃ-ষোড়শীও এক মাতৃ-উপাসনা; হিন্দুর অনেক ব্রত, নিয়ম, ক্রিয়া, উপাসনারই নামান্তর। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ মানব-হৃদয়-তত্ত্ব বুঝিয়াই সে সকল শুভকর নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। আজি কালি দেশের অনেক ব্যক্তি কিনা স্বদেশীয় সকল প্রথাই "ঘৃণিত" ও "কুসংস্কার" বলিয়া মুখ বিকৃত করেন, তাই আমরা এ সকল কথা লিখিলাম। যিনি হিন্দু আর্য্যগণের মাতৃ-ষোড়শী বুঝিবেন, তিনি হিন্দু আর্য্যগণের মাতৃ-ভক্তি-তত্ত্বও বুঝিবেন, ইহা আমি বিশেষ আশা করি। তবে এ আশা আমার দুরাশা কি না তাহা বলিতে পারি না।

উপসংহার কালে আমরা বলি, এজগতে মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি। মানবের সকল উন্নতির মূল ভক্তি; আত্মোন্নতি, পারিবারিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতি, জাতীয় উন্নতি—সকল প্রকার উন্নতি ভক্তিযোগেই সাধিত হয়। ভক্তিবৃত্তির সর্ব্বোচ্চ স্থান ভগবান্, কিন্তু মাতৃ-ভক্তিই ভক্তির আরম্ভ স্থান। গোড়ায় মাতৃ-ভক্তি, আগায় ভগবদ্ভক্তি-রূপে সম্পূর্ণতা লাভ করে। আমরা আগে বলিয়াছি, এ সংসারে মাতাই ভগবতী বিশ্বমাতার প্রতিকৃতিরূপিণী; বিশ্বেশ্বরী বিশ্বজগতের জন্য আর মাতৃ-দেবী সন্তানের জন্য দেবভাবে পরিপূর্ণা। যিনি মহাসমুদ্রে যাইতে চাহেন, তাঁহাকে মহানদী বাহিয়া যাইতে হয়, মহানদীর শেষ সীমাতেই সমুদ্র। সেই রকম যিনি ভগবদ্ভক্তির রাজ্যে পৌঁছিতে চাহেন, তাঁহাকে মাতৃ-ভক্তির রাজ্য দিয়া চলিতে হয়, মাতৃভক্তির পূর্ণতাতেই ভগবদ্ভক্তি।

মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন "যে ব্যক্তি দৃশ্যমান ভ্রাতাকে প্রেম করিতে না পারে, সে অদৃশ্যমান ঈশ্বরকে কিরূপে প্রেম করিবে?" আমরাও বলি, যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষদেবতা জননীকে ভক্তি করিতে অক্ষম, সে অপ্রত্যক্ষ ভগবান্‌কে ভক্তি করিবার ক্ষমতা কোথায় পাইবে? বর্ণমালা ত্যাগ করিয়া, লেখাপড়া শিক্ষা অসম্ভব, মাতৃ-ভক্তি না শিখিয়া ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন-চেষ্টাও সেইরূপ অসম্ভব। মাতৃ-ভক্তিই ভক্তিভাবের বর্ণমালা। প্রত্যেক সন্তান ইহা বুঝিয়া মাতৃ-ভক্তি অভ্যাস করিবেন, মাতার মহত্ত্ব ও দেবত্ব স্মরণ করিয়া মাতাতে ঈশ্বরের শক্তি সকল দেখিবেন; প্রীত ও প্রফুল্লভাবে মাতার চরণ বন্দনা, মাতার সেবা শুশ্রূষা, মাতৃ-হিত সাধনে আত্মোৎসর্গ ও মাতৃ পরিতৃপ্তিতে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন। যাঁহার মাতা পরলোকগামিনী, তিনি মাতৃ-ভক্তি বিকাসের জন্য প্রত্যহ দেবার্চ্চনা বা উপাসনার সময়ে মাতার স্নেহ ও দেবত্ব স্মরণ করিবেন, মাতৃ-ষোড়শী-স্তোত্রাদির ন্যায় মাতৃ-ভক্তি-উদ্দীপক স্তোত্রাদি পাঠ করিবেন, মাতৃমূর্ত্তি ধ্যানপূর্ব্বক চরণ বন্দনা করিবেন। পরলোকগতা মাতার উদ্দেশে নিয়মিত শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া ও অন্যান্য সাধুভাবপূর্ণ কার্য্য করা সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন মাতা এজগতেই থাকুন, আর স্বর্গেই থাকুন, সন্তান চিরদিনই মাতৃভাবে তন্ময় হইয়া মাতার আদর্শে আপনাকে সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেন। এজগতে মাতৃঋণতো অপরিমিত অপরিশোধ্য, তবে মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে সন্তানই মুক্তিলাভ করিবেন।

অতএব যিনি মাতৃভক্তি মাতৃ-উপাসনায় সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, তিনি অহঙ্কারশূন্য, বিনয়ী, সহৃদয়, কৃতজ্ঞ, সেবাপরায়ণ, দয়াময়, ক্ষমাময়, সহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল, আত্মত্যাগী, পরার্থপর, জিতেন্দ্রিয়, দেশহিতৈষী* ও ভগবদ্ভক্ত; তিনি পুরুষ হইলে দেব, রমণী হইলে দেবী। হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্র এই রকম নরদেবতাকেই "মুক্ত" বলিয়াছেন (১), আমরাও এই রকম নরদেবতাকে ইহলৌকিক "মুক্ত" বলি।—পরলোকেও যে এই রকম ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য—আত্মার যতদূর সদ্গতি সম্ভব, তাহাই যে প্রাপ্ত হন, একথা বলা বাহুল্য। ভগবতী বিশ্বমাতা স্নেহের হস্ত প্রসারণ করিয়া মাতৃভক্ত সন্তানকে, তাঁহার অমৃতময়

* মাতৃভক্তকে দেশহিতৈষী বলিলাম, কারণ জননীও জন্মভূমি একই রকমের পদার্থ। তাই যিনি জননীর মর্ম্ম বোঝেন, তিনি জন্মভূমিরও মর্ম্ম বুঝিতে পারেন।

(১) জ্ঞান-বিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা, কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
মুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সম-লোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চনঃ।
ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ ৮ শ্লোক।

যাঁহার আত্মা জ্ঞান বিজ্ঞানে তৃপ্ত, যিনি নির্ব্বিকার জিতেন্দ্রিয়, লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চনে সমদর্শী, সেই যোগীই মুক্ত।

কোলে স্থান দিয়া থাকেন। তাই ডাকিতেছি, ভাই এস, ভগিনী এস, একবার সকলে মাতৃভক্তিরূপ মহাসাগরে—মহা সমুদ্রে ডুবিব, মাতৃউপাসনা করিতে শিখিব, তাহা হইলে এ জীবন সার্থক হইবে, আমাদের মুক্তি লাভ হইবে। মূর্খ হই, অধম হই, নগণ্য হই, আমরা মায়ের সন্তান তো বটে। মা'র আশীর্ব্বাদে সিদ্ধকাম হইব।

লেখিকা
শ্রীমা——

বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীদিগের অবস্থা।

(৩৬০ সংখ্যা ২৭০ পৃষ্ঠার পর।)

স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের সংমিশ্রণেই মনুষ্যসমাজ। একের যাহা দোষ গুণ, অপরেও তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে সমাজে পুরুষগণ কুরুচিগ্রস্ত, সে সমাজে স্ত্রীজাতি লজ্জাশীলা ও পবিত্রতা-আকাঙ্ক্ষিণী হইলেও তাঁহাদিগের রুচি অপবিত্র ও হীন ভাব ধারণ করে। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বঙ্গ মহিলাদিগের মধ্যেও এইরূপ দোষ ঘটিয়াছিল; গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়া উপলক্ষে স্ত্রীদিগের মধ্যে অতি ঘৃণিত আমোদ প্রচলিত ছিল। তদ্ভিন্ন সমবয়স্কারা একত্র হইয়া যে সকল রসিকতা করিতেন, তাহা ন্যক্কারজনক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রীলোকেরা ক্রিয়া বিশেষ উপলক্ষে কুৎসিত ভাবে নৃত্য ও গীত করিতেন, এমন কথাও শুনা যায়।

বাঙ্গালার গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়া উপলক্ষে স্ত্রীজাতির যেরূপ কুরুচির পরিচয় পাওয়া যাইত, ভারতের অন্যান্য স্থানে (হিন্দুস্থান, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি) বিহু, হোলী, প্রভৃতি পর্ব্বে সেইরূপ কুরুচির ছড়াছড়ি হইত, শুনা যায়। ইহাতে কেবল বাঙ্গালি নহে, ভারতের অন্যান্য উচ্চতর জাতিও যে রুচিদোষে দূষিত ছিলেন, এ কথা বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ তখন রুচির আন্তরিক ভাগ বিশেষ ত্রুটী পূর্ণ ছিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শরীরের বেশ, ভূষা ও আলাপাদির দ্বারা মানবের রুচির বাহ্যিক ভাগ প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে বাঙ্গালায় বাবুগণ পর্য্যন্ত সচরাচর পিরাণ, জামা, জুতা, মোজা প্রভৃতির ধার ধারিতেন না। এখন যেমন রাজকর্ম্মচারীদিগকে ইংরেজী পরিচ্ছদ পরিয়া আপিসে যাইতে হয়, তখন সেইরূপ মুসলমানী পরিচ্ছদ ব্যবহৃত ছিল। সাধারণ ব্যক্তিগণ ধুতি চাদরেই দিন কাটাইতেন; ধনী গৃহের বালকেরা ১৮।২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হার, বাজু, বালা, গোট প্রভৃতি গহনা ব্যবহার করিতেন। বঙ্গমহিলারা কপাল, নাসিকা, চিবুক প্রভৃতি উল্কি দিয়া

চিত্রিত করিতেন। কোনও কোনও ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা হস্তবক্ষ প্রভৃতি অবয়বে "রাম, দুর্গা" ইত্যাদি দেব দেবীর নাম উল্‌কি দিয়া চিত্রিত করিয়া লইতেন। সধবারা সিঁথি, কপাল ও নাসিকায় বহু পরিমাণে সিন্দুর লেপন করিতেন। সাদা দাঁত তাঁহাদিগের পছন্দ হইত না, এজন্য মিসি ব্যবহারে দন্ত গুলি "ভ্রমর কৃষ্ণ" করিতেন। নবীনারা চুল বিনাইয়া বহুতর দড়ি দিয়া, মাথার উপরে (প্রায় ব্রহ্মতালুকার কাছে) লম্বা রকমের খোঁপা বাঁধিতেন। সম্মুখের চুলগুলি ছোট ছোট করিয়া কাটিতেন; কাটা চুল গুলি "ঝাপ্‌টা" নামে কর্ণমূলে শোভা পাইত। ধনিগৃহের রমণীদিগের সোণা ও রূপার দুই সুট গহনা থাকিত; সোনার সুট নৈমিত্তিক গহনা অর্থাৎ ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে ব্যবহৃত হইত; আর রূপার সুট নিত্য গহনা অর্থাৎ সকল সময়ে ব্যবহৃত হইত। সে সকল গহনার নাম শুনিতে যদি কেহ ভগিনীরা কেহ উৎসুক হন, সেজন্য তাহাও বলিতেছি; নাকের গহনা নথ, অর্দ্ধ চন্দ্র; কাণের গহনা চাঁপা, কড়ি; গলার গহনা মোহন, বড় বড় মাদুলি; মণিবন্ধের গহনা তাড় বাজু; হাতের গহনা বাউটী, পৈঁছে, খাড়ু; কোমরের গহনা গোঠ, চন্দ্রহার; পায়ের গহনা সারামল, বাঁকমল, ইত্যাদি ইত্যাদি। গহনাগুলির আকৃতি যেরূপ ছিল, তাহার নমুনা এখন পাওয়া যায় না, তবে আমার পাঠিকা ভগিনীদিগের মধ্যে যদি কেহ প্রপিতামহী বা প্রমাতামহীঠাকুরাণীদিগের কোনও গহনা দেখিতে পাইয়া থাকেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা সকল সময়েই একবস্ত্রা অর্থাৎ একখানি মাত্র কাপড় পরিয়া থাকিতেন। তখন বিলাতি কাপড় বা পাছাপেড়ে সাড়ী এ দেশে ছিল না; দেশের তাঁতি, জোলাদিগের হাতের কাপড় পরিয়াই তাঁহাদের দিন কাটিত। উৎসবের সময়ে ধনী রমণীরা মেঘডুম্বুর, আশ্‌মানতারা, রাসমণ্ডল, লক্ষ্মী বিলাস, সাটীন—এই সকল বহুমূল্য বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। বেনারসী তখন বড় একটা ব্যবহার্য্য ছিল না। সধবারা প্রচুর পরিমাণে শাঁখা ব্যবহার করিতেন।

বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানের মহিলাদিগের পরিচ্ছদাদি অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। একশতাব্দীর পরেও তাহা যে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এমত বোধ হয় না। তবে পশ্চিম প্রদেশীয়া রমণীগণ সর্ব্বাঙ্গে উল্‌কির গহনা পরিতেন। অদ্যাপি সেদিকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর রমণীগণের মধ্যে তাহা প্রচলিত আছে। প্রাচীন সময়ে সাধারণ রুচির এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য ও পরিশ্রম—গত শতাব্দীর প্রথম যুগে ভারতবাসিনীদিগের স্বাস্থ্য এখনকার অপেক্ষা যে অনেক ভাল ছিল, একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন।

ইহার প্রকৃত কারণ শরীর-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন; কিন্তু তথাপি আমাদিগের বোধ হয় যে তখনকার রমণীরা অতি অল্প বয়সেই গৃহকর্ম্মে অভ্যস্ত হইতেন; ব্যায়ামে যে ফল লাভ হয়, নিয়মিত রূপে অঙ্গচালনা ও শ্রম করিলে তদনুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা; তাই গৃহলক্ষ্মীগণ ভাত রাঁধা, জলতোলা, বাসনমাজা, ঘরলেপা, ধানভানা, ঘুঁটে-ভাঙা, গোয়াল পরিস্কার করা প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিয়া অনেক সুস্থ ও সবল ছিলেন। শারীরিক বলে তাঁহারা এখনকার অনেক "সুকুমার" পুরুষদিগের উপরেও স্থান পাইবার যোগ্য। সাহস যে প্রধানতঃ শারীরিক বলের ফল একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন *। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন রাজ-শাসনের শিথিলতা এবং অন্যান্য কারণে ভারতে লুঠতরাজ, চুরি ডাকাতি প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু তখন—বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা ভারতের সকল জাতি অপেক্ষা ভীরু ও দুর্ব্বল বলিয়া পরিচিত, তখন সেই বাঙ্গালি জাতিরও প্রকৃত সাহস ছিল; বঙ্গীয় অবলাদিগের এমন সাহসের কথা শুনা যায় যে অভি-ভাবক পুরুষগণ বাড়ী না থাকিলে রম-ণীরা স্বয়ং অস্ত্রধারিণী হইয়া চোর, ডাকাত অথবা হিংস্র জন্তুদিগকে তাড়না করি-তেন! * এখনকার দিনে এ সকল কথা "আষাঢ়ে গল্প" বলিয়াই বোধ হয়। যাহা-হউক গত শতাব্দীর প্রথম যুগে ভারত মহিলাদিগের ব্যক্তিগত অবস্থা সাধারণতঃ এই রকমই দাঁড়াইয়াছিল।

পারিবারিক অবস্থা—আমরা রমণী-গণের ব্যক্তিগত অবস্থা যতটুকু চিত্রিত করিলাম, তাহাতে গত শতাব্দীর প্রথম যুগে নারীজীবন যে বড় সৌভাগ্যপূর্ণ ছিল না, একথা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা পারি-বারিক জীবনই তাঁহাদিগের পক্ষে অধিক-তর দুর্ভাগ্যজনক। নারী-জীবনের অজ্ঞানতা, নির্ধনতা, পরাধীনতা, পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত থাকাতে সপত্নীযন্ত্রণা, বৈধব্যদশা উপস্থিত হইলে অসহনীয় ক্লেশ—এই সকল দুর্ঘটনার কখন কোনটী আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় ভারত-বাসিনীদিগকে জীবন্মৃতা থাকিতে হইত; সুতরাং কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠা হইলে মাতা পিতা ও বন্ধুগণের আনন্দ লাভ দূরে থাকুক, দারুণ দুঃখই জন্মিত। সদ্যোজাতা কন্যার এক বিভীষিকাময় পরিণাম তাঁহাদিগের মনশ্চক্ষে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগের হৃদয় দারুণ নৈরাশ্যে

* সাহসের আর এক কারণ সাধুতা। অসাধু বলবান্ হইলেও প্রকৃত সাহসী হইতে পারে না।

* কুমারী শার্লট স্মিথ, তাঁহার কাগজে স্ত্রীলোকদিগকে ব্যায়াম শিখাইতে লিখিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় ব্যায়ামে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। তাঁহাদের দেশে স্ত্রীলোকের ব্যায়াম সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এদেশে ব্যায়াম শিখিবার মত দেবী চৌধুরাণী সহজে মিলিবে না গার্হস্থ্য কর্ম্মই ভারত-মহিলাদিগের ব্যায়াম।

পূর্ণ হইত। একে কন্যা সন্তান হইতে বংশের কোনও উন্নতি সম্ভব হয় না, তাহার পরে তাহাদিগের জীবনে এই সকল দুরবস্থার আশঙ্কা, তাই পুত্র সন্তান যেরূপ আদর ও যত্ন লাভ করিত, কন্যা সন্তানের ভাগ্যে সে রকম কিছুই হইত না। অনেক স্থলে তাহারা অনাদৃতা ও অবহেলনীয়া হইত।—বুঝি ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক সহিতে হইবে বলিয়াই শৈশবে অভাগিনীদের ভাগ্য-ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতার বীজ উপ্ত হইয়া থাকিত। যাহা হউক ক্রমশঃ গর্ভধারিণীর স্নেহে, আত্মীয়গণের পালনে, সকলের উপরে বিশ্বজননীর কৃপায় শিশু বালার দেহ ও জীবন পরিপুষ্টি লাভ করিত। বালিকা বয়সে তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্তা হইয়া খেলাঘরে গার্হস্থ্য জীবনের অভিনয় করিত; বালিকা বিদ্যালয়ে তাহাদিগকে লেখা পড়া শিখিতে হইত না, কিন্তু খেলা ঘরে বধূ গৃহিণী প্রভৃতি সাজিয়া রন্ধন, পরিবেশন, শিষ্টাচার প্রভৃতি আচরণে গৃহধর্ম্মের কার্য্যে অভ্যস্তা হইত। বঙ্গীয় বালিকাগণ ক্রমে সেঁজুতি, এয়ো-সিন্দুর, গোকাল, আদর সিংহাসন ইত্যাদি ব্রতাচরণে প্রবৃত্তা হইতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত মা, ঠাকুরমা, পিসীমা প্রভৃতির সহিত গৃহকার্য্যে যোগ দান করিতেন। কন্যাদিগের বিনয়, লজ্জা, শীলতা, ধর্ম্মভাব, বাধ্যতা ও গৃহকার্য্যে নিপুণতা শিক্ষা দেওয়া অভিভাবিকা-দিগের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

বিবাহ মানব জীবনের এক প্রধান সংস্কার। কিন্তু বিগত শতাব্দীর প্রথম যুগে দেশীয় মহিলাদিগের অনেকের বিবাহ এত অল্পবয়সে সম্পাদিত হইত যে প্রাপ্তবয়সে নিজের বিবাহের বিষয় কাহারও স্মরণ থাকিত না। আর্য্য ভারতের পরবর্ত্তী সময়েও এদেশে প্রাপ্ত বয়সে রমণীগণের বিবাহ চলিত ছিল, কিন্তু বল্লাল সেনের স্থাপিত কৌলীন্য প্রথা ও মুসলমান রাজগণের অত্যাচার, এই দুইটী ঘটনা হইতেই প্রধানতঃ বাল্য বিবাহের প্রাদুর্ভাব হয়। কৌলীন্য প্রথা হইতে কন্যা পণের উৎপত্তি; কন্যাপণের জন্যই বাল্য বিবাহ অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল।—বিবাহের সময়ে কন্যার পিত্রাদি বর পক্ষের নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করিলে তাহাকে "কন্যাপণ" কহে। যাঁহারা ব্রাহ্মণবংশে উচ্চশ্রেণীর শ্রোত্রীয় ও কায়স্থ বংশে উচ্চশ্রেণীর কুলীন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে (এখনকার পাস্‌করা ছেলের বাপের মত) কন্যার বিবাহ দিয়া প্রচুর টাকা লাভ করিতেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-গণ অদ্যাপি কন্যাপণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু এই রকম পণ লইয়া কন্যার বিবাহ দেওয়াকে আর্য্য-ধর্ম্মাচার্য্যগণ "আসুর বিবাহ" বলিয়া গিয়াছেন; "আসুর" শব্দের অর্থ নিন্দিত, অপবিত্র, অশুভকর, ইত্যাদি। মনু বলিয়াছেন—

"পঞ্চানান্তু ত্রয়ো ধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্মৌ স্মৃতাবিহ।
পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব নকর্ত্তব্যো কদাচন॥"